সুদূর সকাল

বুদ্ধদেব গুহ

তোমার শোবার ঘরে একটা গডরেজের আলমারি ছিল। সে আলমারির সামনে রোজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি আমায় পড়াতে বসাতে। তুমি বসতে আলমারিতে হেলান দিয়ে, আমি তোমার সামনে খালি গায়ে খাকি হাফ প্যান্ট পরে বসে পড়াশুনা করতাম।

পড়তে বসার আগে পার্কে গিয়ে ফুটবল খেলতাম গরমের দিনে। তারপর চৌবাচ্চা থেকে ঝপাঝপ করে গায়ে জল ঢেলে চান করে নিতাম। তুমিও তার আগে গা ধুয়ে নিতে। তোমার গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরতো।

তোমার গায়ের গন্ধ আমার চিরদিনই বড় প্রিয় ছিল। চান করে উঠে, তুমি বড় করে সিঁদুরের টিপ পরতে কপালে। বাড়িতে কাচা, কিন্তু পরিষ্কার শাড়ি-জামা পরতে চানের পর; তারপর নিজে হাতে বানানো এক কাপ চা খেতে। কখনো-সখনো আমি সেই চায়ের কাপের তলানিটুকু এক ঢোকে গিলে ফেলে তোমার কাছে বকুনি খেতাম।

তুমি যতদিন আমাকে পড়িয়েছিলে, আমি ততদিন সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম। তুমি যখন আর পড়াতে পারতে না, তখন পড়াশোনায় খারাপ হয়ে গেছিলাম।

ভবানীপুরের বাড়িটার কথা এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে আমার। বড় রাস্তা থেকে সরু গলি দিয়ে ভেতরে যেতে হতো অনেকখানি। সরু, মানে ভীষণ সরু, তাতে দুজন লোকের পাশাপাশি হাঁটতে অসুবিধা হতো। সেই গলি দিয়ে গিয়ে ডানদিকে দরজা ছিল। সবুজ রং করা কাঠের দরজা। তাতে বাবার নাম লেখা ছিল ঃ এম, এন, রায়।

সেটি ছিল বাইরের ঘর। শুধু বসবার নয়, আমাদের বাড়িতে যে কাজের লোক ছিল, রত্না, সেও শুতো কখনো-সখনো। সেই ঘরই ছিল আমার পড়াশোনার ঘর, বাইরের লোকের বসবার ঘর; আরও অনেক কিছুর ঘর।

সেই ঘর পেরিয়ে এসে এক ফালি বারান্দা।

সেই বারান্দার পাশে ছোট্ট একটা উঠোন মতো। উঠোনে নেমে ডানদিকে ছিল পায়খানা। গ্রাম্য প্ল্যান ছিল বাড়িটায়।

সেই বারান্দার পাশে, বসবার ঘরের লাগোয়া শোবার ঘর, যে ঘরে সেই গডরেজের আলমারি। আলমারির সামনে একটু ফাঁকা জায়গা আর ঘর-জোড়া খাট। পুবে ছিল দুটো বড় বড় জানালা আর জানালার সামনেই খাট; মানে তক্তপোষ। সেখানেই আগে আমি তোমার সঙ্গে শুতাম। বিনু ও মিনু, আমার দুই বোনও শুতো। আর তার পাশেই গডরেজের আলমারির উল্টোদিকে আর একটা খাট ছিল। সেই খাটে বাবা শুতেন। আমি যখন বড় হয়ে গেলাম, বোনেরাও যখন আস্তে আস্তে বড় হল, তখন আর ওই ভিতরের ঘরে শুতাম না, বাইরের ঘরে গিয়ে শুতাম ঠাকুরমার সঙ্গে।

পথে পথে গ্যাসের বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে বসতে হতো। বেশ কিছুক্ষণ পড়াশোনা হওয়ার পর বাবা আসতেন অফিস থেকে। এসে ঐ ঘরেই খাটের উপর বসে জুতো খুলতেন, কোটটা খুলে হ্যাংগারে তুলে, দেয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখতেন। তারপর জামা-প্যান্ট খুলে, লুঙ্গি-গামছা নিয়ে বাথরুমে যেতেন চান করতে।

বাথরুমটা ছিল শোওয়ার ঘরের পাশে যে আরও একটা ঘর, সেই ঘর পেরিয়ে গিয়ে। সিঁড়ি ভেঙে নামতে হতো। বাথরুমটা ছোট্ট। টিনের ছাদ-দেওয়া। টিনের দরজা। বড় একটা চৌবাচ্চা। বাথরুমের পাশেই ছিল রান্নাঘর, রান্নাঘরের ভিত উঁচু ছিল না। বর্ষাকালে রান্নার ঘর ভেসে যেত জলে। নর্দমার জল ভরে যেতো রান্নাঘরে। রান্নাকরা জিনিস সমেত হাঁড়িকুড়ি, বাসনপত্র সব ঘরময় ভেসে বেড়াতো। তার মধ্যে সাঁতার কাটতো তেলাপোকা, ডুবে মরতো নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা।

এক বর্ষার রাতে আমরা যখন শোবার ঘরের পাশের ঘরে মেঝের বেতে-বোনা আসন পেতে বসে খাচ্ছিলাম, তখন এক কাণ্ড হয়েছিল। খিচুড়ি রান্না হয়েছিল সেদিন। রান্না করেছিল বুড়ো কেষ্ট। তার বাড়ি ছিল উড়িষ্যাতে। বড় ভালো লোক ছিল বুড়ো। চোখে বড় কম দেখতো, তার উপর ছিল রাতকানা। কড়াইতে যখন আলু ভাজছে সে, আলুর সঙ্গে দুটো তেলাপোকাও ভাজা হয়ে গেছিল। কেষ্ট রাত্তিরে দেখতো না। দোষ ওর ছিল না। দোষ তেলাপোকা দুটোরই। তারা আত্মহত্যা করবে বলে আলুর সঙ্গে কড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে না-পড়লে এমন কাণ্ডটা ঘটতো না।

আলুভাজার সঙ্গে খিচুড়ি মেখে খাচ্ছি, আলু ভাজা মুখে পুরে দিতে কেমন যেন একটা নতুন নতুন স্বাদ মনে হল। মুখের মধ্যে মচমচ করে উঠলো। সেই মচমচানিটা আলুভাজার মচমচানি থেকে একেবারেই অন্যরকম লাগলো। স্বাদটাও, বলা বাহুল্য ভিন্ন। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে আলু বের করে দেখি যে, আলু নয়, কড়কড়ে করে ভাজা তেলাপোকা।

যে ঘরে বসে আমরা খাচ্ছিলাম, সে ঘরটার চতুর্দিকে বাক্সের পর প্যাঁটরা, তার উপরে বাক্স, তার উপরে হাঁড়ি-কুড়ি, চাল-ডাল, আনাজ-তরকারি সব কিছুই থাকতো। সেই ঘরেরই একটা কোণায় ছিল ঠাকুরঘর। একটা কাঠের সিংহাসনে ঠাকুরমার তেত্রিশ কোটি না হলেও অন্ততপক্ষে তেত্রিশ জন ঠাকুর দেবতা সাজানো থাকতেন। অন্যপাশে ঠাকুরমা তখন হবিষ্য রান্না করতেন। তুমি সব যোগাড় দিয়ে দিতে। ঠাকুমা তখন নিজেই রান্না করতেন এবং মাঝে মাঝে সে হবিষ্য রান্নার ভার তোমার উপরও পড়তো।

ঝকঝকে করে মাজা পেতলের হাঁড়ি, শ্বেত পাথরের থালা, লাল পাথরের গ্লাস, কালো পাথরের বাটিতে খেতেন। সব সময় ঐ ঘরটা থেকে কেমন একটা সোদা সোদা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুতো। সে গন্ধটা একটা মিশ্র গন্ধ। চাল-ডাল, তেল-নুন, শুকনো লংকা, কালোজিরে, গোলমরিচ– এইসব গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকতো বাসি ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, বাতাসার গন্ধ, কদমার গন্ধ, নারকেলের গন্ধ আর ঠাকুমার হবিষ্য

রান্নার আতপ চাল এবং ঘিয়ের গন্ধ।

সেই ঘরটার পাশে একটা গলি ছিল। সে গলিটা কানাগলি। সেই গলির মধ্যে ঐ তেতলা বাড়ির যত টুকিটাকি অপ্রয়োজনীয় জিনিস সব ফেলা হতো। আমি কিছু ফেলতাম না। দোতলার ভাড়াটে ও তেতলার বাড়িওয়ালা অনেক কিছুই সেখানে ফেলতেন। সেই ঘরের লাগোয়া যে বড় জানালাটা ছিল, সেই জানালাটার তাকে বসে গরাদ দিয়ে আমি পাশের গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

দুপুর বেলায়, ছুটির দিনে অথবা গরমের ছুটির সময় যখন সারা বাড়ি নিঝুম, মধ্যের ঘরে মা বোনেদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পরে শুয়ে থাকতেন তখন আমি জানালার তাকে বসে সেই গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

কেউ আম খেয়ে আঁটি ফেলেছিল কখনও, সেই আঁটি থেকে গজিয়ে উঠেছে নতুন আমের চিকন চারা। ফেলে দেওয়া শিশি-বোতলের টুকরো, ভেঙে যাওয়া, ব্যবহারে মলিন রঙিন চিরুনি, রিবন, কদবেলের খোসা, ভাঙা কাঁচের চুড়ি, নানা ন্যাকড়া, নানারকম কাগজ, ঠোঙা, আরও কত কি! সেই বিচিত্র আবর্জনার মধ্যে নিস্তব্ধ গ্রীষ্ম-দুপুরে একা একা চেয়ে থাকতে থাকতে যে কী সৌন্দর্য, কী শান্তি দেখতে পেতাম তখন, এখন সেকথা ভাবলেও অবাক লাগে।

ছেলেবেলায় সব কিছুই এত ভালো লাগত। চোখ তখন এত অনাবিল ছিল, মন তখন এত সরল ছিল, তখন পৃথিবীর এই কুটিল কুচক্রী আবর্ত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এত কম থাকে যে কাকের চেহারার মধ্যেও পরম সৌন্দর্য চোখে পড়ত তখন। বন্ধ গলির আবর্জনার মধ্যে আবিষ্কৃত হতো পরম ঐশ্বর্য।

খাঁ-খাঁ দুপুরে ঝাঁ-ঝাঁ করে চলে যাওয়া ট্রামের আওয়াজের মধ্যে দূরে রহস্যময় দিগন্ত সুপ্ত ছিল তখন। কল্পনা ছিল অবাধ, অবকাশ অনন্ত, কত ছোটই ছিলাম তখন, কিন্তু কল্পনার ঘোড়ার বলগা ধরে বসে কোথায়-না-কোথায় যে চলে যেতাম, কেউই আমাকে বাধা দিত না। কেউ খবরদারী করতে আসত না। কোথাও হারিয়ে যাওয়ার মানা ছিল না তখন মনে মনে।

২.

মা গো, তোমার কথা বলতে বসে কত কী অবান্তর কথা মনে আসছে।

কিন্তু এ-সমস্তই তোমার স্মৃতি ঘিরে। তুমি ছিলে বলেই এই সমস্ত কিছুর অবতারণা আজ। তোমাকে সারা দিনে খুব বেশি কাছে পেতাম না। কিন্তু তবুও যখন পেতাম, তোমার স্নিগ্ধ, সুন্দর, উজ্জ্বল সান্নিধ্য আমার মনে, আমার শরীরে এমন এক প্রলেপ লাগাতো যে, তা আজও অন্তরে, শরীরে অনুভব করি।

জ্বরের মধ্যে বেহুশ হয়ে যখন পড়ে থাকতাম; যখন তুমি কপালে তোমার নরম হাত রাখতে, তখন মনে হতো বুঝি সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল। অসুখ করলে, সে যে বয়সেই হোক না কেন, তুমি চিরদিন আমাকে কাছে টেনে নিতে, তোমার কাছে রাখতে। যখন অনেক বড় হয়েছিলাম, তখনও আমার অসুখে তুমি এসে সব সময় আমাকে দেখাশোনা করতে।

মায়ের হাতের পরশ যে আরোগ্যবাণী নিয়ে আসে সন্তানের মনে, সে-বাণী যে আর কারো পক্ষেই পৌঁছানো সম্ভব নয়।

যখন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি, তখনও পরীক্ষা দেবার সময় খুব নার্ভাস হয়ে পড়তাম। অন্য কোন ব্যাপারে নার্ভাস ছিলাম না, অথচ পরীক্ষার সময়ে কেন যে নার্ভাস হতাম, সেটা আজও বুঝে উঠতে পারি না। পরীক্ষার প্রস্তুতি যে থাকতো না তা নয়, কিন্তু পরীক্ষাতে যেমন ফল করবো ভাবতাম, তেমন ফল করা কখনোই সম্ভব হতো না। কারণ ঠিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়টাতে চিরদিনই অত্যন্ত উত্তেজিত ও ভীত হয়ে পড়তাম। সেই সময় প্রত্যেকদিন পরীক্ষার শেষে আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে আসতে তুমি। মনে আছে, গরম জলে বায়োকেমিক ওষুধ ক্যালিফস্ গুলে আমাকে খাওয়াতে। যতদিন পরীক্ষা চলতো ততদিনই আমি রাতে তোমার ঘরে শুয়ে থাকতাম।

মা, আজকে আমার জীবনে রোজই পরীক্ষা। শুধু আমার কেন, হয়তো প্রত্যেকের জীবনেই। যে পরীক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক, যে পরীক্ষা স্কুল-কলেজের অথবা ইউনিভার্সিটির, সে পরীক্ষা যে জীবনের সহজতম পরীক্ষা, তা প্রত্যেক মানুষই শুধুমাত্র বড় হবার পরই বুঝতে পারে।

এখন সকাল থেকে রাত অবধিই পরীক্ষা। যৌবনের পরীক্ষা, প্রেমের পরীক্ষা, বিরহের পরীক্ষা, বিশ্বাসের পরীক্ষা, পুত্রের পরীক্ষা, পিতার পরীক্ষা, স্বামীর পরীক্ষা, স্ত্রীর পরীক্ষা, সম্পর্কের পরীক্ষা, বন্ধুত্বের পরীক্ষা, জীবিকার পরীক্ষা, সততার পরীক্ষা, প্রৌঢ়ত্বের পরীক্ষা, বার্ধক্যের পরীক্ষা, পরীক্ষার পর পরীক্ষা।

আজকে তুমি নেই। গরম জলের সঙ্গে ক্যালিফস্ গুলে আমাকে আর কেউ খাওয়ায় না। অথচ তবুও কোনো পরীক্ষাতেই পিছপা হওয়া যায় না বেঁচে থাকবার কারণে। তুমি ছাড়াই সমস্ত পরীক্ষায় বসতে হয়, পাস অথবা ফেল করতে হয়। কিন্তু আজকে পরীক্ষা পাস করলে, জীবনের স্কুল থেকে নিত্য-নতুন সাফল্যের রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলে, কারো মুখই আনন্দে তোমার মুখের মতো আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। কেউ আমাকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে, গর্বে ফুলে উঠে আর বলে না, খোকন, আমার যা আনন্দ হচ্ছে না! বলতে পারছি না।

এখনও পরিষ্কার মনে আছে, বাবা একবার আমাদের পূজোর সময় বিন্ধ্যাচলে নিয়ে গেছিলেন। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর শহর থেকে মাইল তিন-চার দূরে ছোট্ট একটি গ্রাম। তার নাম শিউপুরা।

পাথরের বাড়ি, কয়েকটি ছোট ছোট, মধ্যে দিয়ে ফাঁকা রাস্তা চলে গেছে। সে রাস্তার বুক চিরে চলে গেছে রেল লাইন এলাহাবাদের দিকে। বাঁ-দিকে বেনারস। শিউপুরার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা-মাঈ। সারাদিন সেই নদীর উপর ঘুরে ঘুরে চখাচখি ওড়ে। নদীর ঘাটে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছ, কী ছায়া তার!

তুমি কিন্তু কখনও নদীতে চান করতে যেতে না। জলে তোমার বড় ভয় ছিল। একবার পুরীতে গিয়ে বাবা আমাদের বলেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে সমুদ্রে একটা ডুব দেওয়াতে পারি, তাহলে দশ টাকা দেবেন। তখনকার দিনে দশ টাকার প্রলোভনটা নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু আমাদের সকলকেই সেদিন ব্যর্থ হতে হয়েছিল। তুমি পায়ের পাতাটুকু খালি ভিজিয়েছিলে সমুদ্রের জলের ঢেউয়ে। তার বেশি ভিতরে তোমাকে আর কারো পক্ষেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিন্ধ্যাচলের কথা বলছিলাম। সেই ছোট্ট ঘুমন্ত শিউপুরা গ্রাম ছাড়িয়ে কাঁচা পাথুরে একটা পথ পিচের রাস্তাকে সমকোণে কেটেছিল। সেই বড় রাস্তাটা রেললাইনের সমান্তরালে চলে গেছে। টান টান হয়ে রেললাইন শুয়ে আছে একটা বিরাট কালো, চকচকে সাপের মতো। তার মুখ রয়েছে এলাহাবাদে আর লেজ রয়েছে বারাণসীতে। কাঁচা রাস্তাটা শিউপুরা থেকে এসে উঠে গেছে বিন্ধ্যপাহাড়ের উপরে।

পাহাড়ের উপরে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে সেই মন্দিরে উঠতে হয়, দু'পাশে ছোট-খাট দু-একটি দোকান পান্ডাদের। ক্ষীরের মিঠাই তৈরি করে পান্ডারা, বহু দূর দূর থেকে তীর্থযাত্রীরা এসে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে পূজো দিয়ে যান। পথের দু'পাশে জঙ্গল ঘন হয়ে থাকে। পবন নন্দনের দল হুপ-হাপ শব্দ করে জঙ্গলের নিস্তব্ধতাকে মথিত করে। কিন্তু বড় শান্তির পথ ছিল বিন্ধ্যবাসিনীর পথ।

তোমার ভগবানকে কোনোদিন তুমি দেখেছিলে কিনা জানি না আমি। কিন্তু বিপদে, আনন্দে, নির্জনতায়, কোলাহলে তাঁর অস্তিত্ব হৃদয়ে অনুভব করাতে শিখিয়েছিলে আমায়। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে যেতাম বিকেল বেলায়। সেই নির্জন পাহাড়ী বনপথ দিয়ে। যখন ময়ূর ডাকতো এপাশ-ওপাশ থেকে ক্কেয়া ক্কেয়া ক্কেয়া রবে, যখন কত না কত পাখি সন্ধ্যার আরতি জানাতো বিন্ধ্যবাসিনীকে, তখন একটি মুগ্ধ শিশু তার সুন্দরী মায়ের নরম হাতে হাত রেখে ভগবান দর্শনে যেত প্রতিদিন।

আমি কিন্তু কোনোদিনও মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি। মন্দিরের ভিতর ঢুকলে আমার কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। আমি বলতাম আমি বাইরে আছি, তুমি পূজো দিয়ে এসো। আশ্চর্য, তুমি কোনোদিনও আমাকে জোর করনি। চিরদিন বলেছ, আচ্ছা তুই বোস, আমি আসছি। পরবর্তী জীবনে তোমাকে দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতাম, যখন তুমি যেতে চাইতে। তখনও আমি চত্বরে বসে থাকতাম, তুমি ভিতরে গিয়ে পূজো দিয়ে

আসতে।

ভগবানে ভক্তি ছিল তোমার অগাধ। সেই ভক্তি তুমি পেয়েছিলে তোমার মায়ের কাছ থেকে, তোমার মামাবাড়ির কাছ থেকে। তুমি বড় নরম ছিলে। রক্ত দেখতে পারতে না তুমি। বাবা যখন পাখি মেরে আনতেন শিকার করে, অথবা হরিণ মেরে আনতেন, শম্বর মেরে আনতেন, আঁতকে উঠতে তুমি সেই রক্তাক্ত পশুপাখি দেখে। কিন্তু কখনও তুমি তা রান্না করে দিতে অস্বীকার করনি। কারণ তোমার স্বামীর শখে তুমি কখনও বাধা দাওনি। কিন্তু মনে মনে তুমি যে এটা পছন্দ করতে না, আমরা সকলেই বুঝতে পারতাম।

৩.

বাবার খুব শিকারের শখ ছিল।

পরবর্তী জীবনে বাবা প্রায়ই শিকারে যেতেন। শিকার সম্বন্ধে তোমার বিরূপতা– বাবার এবং বাবার বন্ধুবান্ধবদের কাছে যাদের সঙ্গে বাবা শিকারে যেতেন তাদের সকলের কাছে এক হাসির ব্যাপার ছিল। যদি কোনোদিন শিকারে গিয়ে শিকার না পাওয়া যেত, তাহলে বাবার বন্ধুরা বলতেন, কি করে হবে শিকার? বাড়িতে যা 'হাই ভোলটেজ রেসিসট্যান্টস' শিকারের দোষ কি?

এই কথা নিয়ে আমরাও অনেকদিন হাসাহাসি করেছি, তোমাকে ক্ষেপিয়েছি।

কিন্তু তমি কেবলই হাসতে আর বলতে, বুঝবি, এমন করে এই পাখি আর জন্তুদের মারিস, ভগবান যে একদিন কি শাস্তি দেবেন তোদের, আমি খালি সেই কথা ভেবে আঁতকে উঠি।

বিন্ধ্যাচলে আমি সারাদিন পাহাড়ের উপরে, মালভূমিতে একা একা হেঁটে বেড়াতাম। বন্দুক নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম। শিকারটা ছিল একটা ছুতো মাত্র। সেই প্রাকৃতিক পরিবেশে, সেই আদিগন্ত মালভূমি, সেই নীল আকাশ, সেই আমলকী তলায় চরে-বেড়ানো চিতল হরিণের দল, গঙ্গার উপরে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ওড়া বাদামী চখাচখির ঝাঁক আর অনেক নিচে সমতলে ধুঁয়ো-উড়িয়ে চলে-যাওয়া দেশলাইয়ের বাক্সর মতো রেলগাড়ি– এইসব গোধূলির আশ্চর্য সুন্দর ছবিগুলি এখনও চোখে ভাসে।

তুমি বলতে, ভগবান কিন্তু মন্দিরে থাকেন না। মাঝে মাঝে মন্দিরে আসেন। ভগবান থাকেন আকাশে-বাতাসে, রোদে-বৃষ্টিতে, হাওয়ায় -মাটিতে, আমাদের নিঃশ্বাসে। ভগবানকে যে বুঝতে চায়, যে হৃদয়ে অনুভব করতে চায়, সে সব সময় তা করতে পারে।

ভগবান কাকে বলে আমি জানতাম না, আজও জানি না।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যের মুখে মুখে বিন্ধ্যাচলের মালভূমির উপর দিয়ে যখন ফিরে আসতাম, যখন শেষ সূর্যের সোনা আলো নরম আলতো আঙুলে সমস্ত মালভূমিতে শায়িত শরীরকে ছুঁতো, সমস্ত মালভূমির গাছ-গাছালি শেষ সূর্যের স্পর্শে ধন্য হতো, যখন ওম-ধরা বুকের ক্ষয়েরী তিতিররা কী এক চমকতোলা তীক্ষ্ণ ডাক ডেকে তাদের উড়ে যাওয়ার সরল তীক্ষ্ণ ছন্দে অপস্রীয়মাণ স্তিমিত সূর্যকে ধাওয়া করে তীরবেগে ছুটে যেত, তখন আমার মনে হতো ভগবান বোধহয় এ-রকম জায়গাতেই থাকেন।

সেই পথের পাশে যখন টি-টি পাখিরা তাদের লম্বা লম্বা উড্ডীন পা নিয়ে পাগলের মতো দল বেঁধে চীৎকার করতো, যখন পাহাড়ের গুহাতে বসে পাশে কমন্ডুলু রেখে নাগা সন্ন্যাসী সামনে ধুনি জ্বালিয়ে ভগবানের নাম গাইতেন, যখন সেই আসন্ন সন্ধ্যার হিমহিম রহস্যময় পরিবেশ দিগন্তের কাছে এক ঝাঁক কৃষ্ণসার হরিণ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত গাছ-গাছালির ধুলিমলিন ধূসর সবুজ আঁচলে, যখন মালভুমি থেকে ফুল-পাতা, ঝোপ-ঝাড়, পাহাড় আর পাখির আর সুন্দরী পৃথিবীর গায়ের গন্ধ মিশে এক আশ্চর্য শান্ত স্নিগ্ধ মিশ্র গন্ধ বেরতো, তখন মনে হতো ভগবান বোধহয় এখানেই থাকেন।

অথবা, যেদিন সূর্য ওঠার আগে স্নিগ্ধ, সিক্ত মালভূমি পেরিয়ে নিচের উপত্যকাতে নেমে যেতাম, যখন কচি-কলাপাতা সবুজ ছোট ছোট টিলা ছাওয়া উপত্যকাতে শিশির পড়ে থাকতো রূপোলী চাদরের মতো, যখন সেই

সবুজ রূপোলী সিক্ত গালচেয় ধূসর-নীল গাইয়ের দল দৌড়াদৌড়ি করে খেলে বেড়াত। যখন প্রথম সূর্যের আলো পড়ে সেই ধাবমান নীল গাইয়ের দলের ক্ষুরে ক্ষুরে ছিটকে-ওঠা শিশিরে লক্ষ লক্ষ হীরে চমকাতো অথবা রাতভর বজরা-ক্ষেত পাহারা দেওয়া গাঁওয়ার ছেলে বাঁশী বাজিয়ে পাহাড়তলীর গাঁয়ে ফিরতো ভোরের বেলায়, সেই বাঁশীর সুরের আবেশে এবং সেই নির্জন আদিগন্ত শান্তিস্বরূপ প্রকৃতিতে দু'চোখ ভরে গেলে মনে হতো বোধহয় ভগবান এখানেই আছেন। ভগবানকে দেখার চোখ, অনুভব করার চোখ, তুমি আমাকে দিয়েছিলে।

৪.

আমাদের কলকাতার বিশেষ বৈচিত্রহীন জীবনে হঠাৎ আনন্দের ঝলক নিয়ে আসতেন ছোট মামা। তুমি যদি রোম্যান্টিক ছিলে, তাহলে ছোট মামাকে কী বলে ব্যাখ্যা করবো জানি না। রোম্যান্টিসিজম ছিল তাঁর প্রতি রক্ত কণিকায়। এত মাত্রায়ই তা ছিল যে, জীবনের বাস্তবতার মুখ সেই রোম্যান্টিসিজমের পর্দা ভেদ করে কোনোদিনও আমৃত্যু তাঁর পক্ষে দেখে ওঠা সম্ভব হয়নি। ছোট মামার মতো সরল শিশুসুলভ দেবদুর্লভ মানুষ জীবনে বেশি দেখিনি। চিরদিন শিশুর মতো একটি অনাবিল মন বজায় রাখার জাগতিক কষ্ট অনেক, সে বড় কঠিন সাধনা।

ছোট মামাও আজ নেই, তাই অনেক কথা মনে পড়ে। দাদুর ব্যবসা ছিল বিহারের সাঁওতাল পরগনায়। অভ্রর খনি ছিল দাদুর। ছোট মামার প্রথম যৌবনে সেই অভ্রর খনির দেখাশোনার ভার পড়েছিল তার উপর । অভ্রর ব্যবসা সম্বন্ধে ছোট মামা কতটুকু উৎসুক ছিলেন, অথবা কতটুকু জেনেছিলেন সে বিষয়ে আমার তখন এবং আজও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ব্যবসা, কোনো ব্যবসাই তার ধমনীতে ছিল না। তার দুই কবি- চোখ মুগ্ধ হয়েছিল সাঁওতাল পরগনার বনপাহাড়ের অপূর্ব সৌন্দর্যে। পরম অসুবিধার মধ্যে থেকেও, এই ডিজেলের ধোঁয়া-ভরা আবর্জনাময় শহরে বাস করেও তিনি চিরদিন তার শালবন, খাণ্ডুলী পাহাড় ও উশ্রী নদীর কল্পজগতে বাস করে গেছেন।

কোনো গরমের সন্ধ্যাবেলায় ছোট মামা আমাদের বাড়িতে আসতেন। বসবার ঘরে আলো নিভিয়ে তিনি গল্প করতেন। তখনকার দিনে সন্ধ্যার পর কলকাতায় এমন এক দখিনা হাওয়া ছড়াতো যে, সেই হাওয়া আজকাল এই মালটিস্টোরিড শহরে আর বয় না। সারাদিনের আর্দ্রতা-ভরা গরম যে ক্লান্তি পুঞ্জীভূত করে তুলতো, সেই সমস্ত ক্লান্তি অপনোদিত হয়ে যেত মুহূর্তের মধ্যে সন্ধ্যের পরের সেই হুহু মিষ্টি বাতাসে।

পথ দিয়ে কুলফী মালাইঅলা, চাই কুলফী মালাই বলে হেঁকে যেত। ফুলঅলা ফিরি করতো বেলফুলের মালা অথবা রজনীগন্ধা। চান-টান করে উঠে তুমি ধূপকাঠি জ্বালাতে, তারপর ছোট মামার জন্যে চা করে নিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে তুমি আমাদের সঙ্গে বসতে এসে।

ছোট মামা গল্প করতেন টিকায়েতের। ডাকাইত টিকায়েত, অত্যাচারী টিকায়েতের। যে কুলীদের সুদের লোভে সর্বস্বান্ত করতো, তাদের মেরে খাদে ফেলে দিত। সেইসব গল্প শুনতে শুনতে দেহাতী সরল মানুষদের কষ্টে তখন আমার চোখে জল এসে যেত।

ছোট মামার এক বন্ধু ছিলেন। মনু মামা। তাকে আমার একবারই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল গিরিডিতে। এখনও তার চেহারাটা মনে আছে। ছ'ফিট লম্বা ধবধবে ফর্সা, একটা বুক-খোলা নীল রঙের টুইলের শার্ট, ধুতির ওপরে পরা। শার্টের হাতা গোটানো। এমন চমৎকার সুগঠিত, সুপুরুষ বাঙালি চেহারা আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। সেই মনু মামা টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে খাদে খাদে ঘুরে বেড়াতেন। দুর্ধর্ষ টিকায়েতরাও তার ভয়ে তটস্থ থাকতো। মনু মামার পিঠে বাঁধা থাকতো চামড়ার বেল্টে লাগানো দোনলা বন্দুক। চাঁদনী রাতে আলোছায়ার বুটি-কাটা গালচের রাস্তা বেয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে পাড়ি দিতেন মনু মামা।

একবার ছোট মামা আর মনু মামা অভ্রর খনিতে যাওয়ার পথে এক গ্রামে রাতের মতো আশ্রয় নিয়েছেন। যে

ঘরে তারা ছিলেন সেই ঘরেই সকালবেলা জঙ্গল থেকে ধরে আনা একটি ভাল্লুকের বাচ্চা এনে বেখেছিল গ্রামের লোকেরা। চাঁদনী রাত। বসন্তের দিন। সন্ধ্যার পর বেশ হিমহিম ভাব থাকে তখন পাহাড়ে জঙ্গলে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। মহুয়া আর করৌনজের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। পাহাড়ী কোকিল ডাকছে পাগলের মতো। পাশের বাড়িতে ঝুমুরের গান হচ্ছে মাদলের সঙ্গে। দ্রিম দ্রিম, দ্রিমি দ্রিম করে মাদল বাজছে আর তার সঙ্গে দেহাতী সুরের ঘুম পাড়ানিয়া গান।

মাটির ঘরের মধ্যে চৌপাই পেতে দুই বন্ধুতে রাতে খিচুড়ি খেয়ে শুয়েছেন। সারা দিনের ক্লান্তি রাতে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে ঘুম এনে দিয়েছে, উপরে খাপরার চাল, ঘুমোবার আগে আগে সেই খাপরার চালের মধ্যে ছুঁচোর নাচানাচির নরম চিকন আওয়াজ তাদের কানে এসছিল। দুদিকে দুটি উঁচু জানালা, কাঠের শিক বসানো, তা খুলে দিয়ে তারা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে কী একটা শব্দ শুনে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। মনু মামা কোনো দিনই ভীরু ছিলেন না। কিন্তু ছোট মামা ভীরু ছিলেন। তার সব রকম ভয় ছিল। ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, ভাল্লুকের ভয়, টিকায়েতের ভয়। তাই ছোট মামা কথাবার্তা না বলে যে চাদরটা বুক অবধি ছিল, সেই চাদরটা তাড়াতাড়ি মুখ অবধি টেনে মুখটাও ঢেকে নিয়ে নিঃসাড়ে শুয়ে রইলেন।

মনু মামা বললেন, কোন হ্যায় রে? বাহারমে কোন হ্যায়?

কিন্তু বাইরের আগন্তুক কোনো উত্তর দিল না। দরজার মধ্যে খচ খচ, খচর খচ করে কী একটা শব্দ হতে লাগলো। মনু মামা পা টিপে টিপে সেই মাটির ঘরের কাঠের গরাদ লাগানো জানালার কাছে উঠে গেলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেন, এক বিরাট ভাল্লুক পিছনের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু'পায়ের নখ দিয়ে দরজাটাকে আঁচড়াচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে মনু মামা তাড়াতাড়ি ছোট মামাকে ডাকলেন।

বললেন, দ্যাখ দ্যাখ ছোটকা, কী অপূর্ব দৃশ্য! জীবনে এমনটি আর দেখতে পাবি না। বলতে বলতে মনু মামা জানালাতে দাড়িয়ে ধারাবিবরণী দিতে লাগলেন : কী সুন্দর চাদের আলো, দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে ভাল্লুকটাকে। বুকের মধ্যে একটা সাদা ভি চিহ্ন। কী বিরাট ভাল্লুকটা রে। আমার চেয়েও লম্বা। উঠে আয়, উঠে আয়। দেখবি তো উঠে আয় ছোটকা।

ছোট মামা বললেন, না। আমি দেখবো না।

কিন্তু ভাল্লুকটা আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার মাকে বাইরে দেখে ভিতরের ভাল্লুকের বাচ্চাও কুঁক কুঁক কুঁক কুঁক করে সমানে তার মার কাছে নালিশ জানিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন বাচ্চাকে তার মার কাছে দেয়া যায় কী করে? দরজা খুললেই তো বিপত্তি! আর ভারতবর্ষের বন-জঙ্গলের মানুষ যে জানোয়ারকে বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পায় তা হচ্ছে ভাল্লুক।

মনু মামার গায়ের লোকদের উপরে ভীষণ রাগ হলো।

ভাবলেন, পরদিন ওদের ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে। প্রথমতঃ এরকম বিপত্তি ঘটবার জন্যে এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের ঘুমের দফারফা করার জন্যে। কিন্তু সে তো সকাল হলে! এখন রাত কী করে কাটে!

অনেক করে মনু মামা ভাবতে ভাবতে শেষে একটা বুদ্ধি বের করলেন। দেখলেন, ঘরের কোণে দু'টি চকচকে টাঙি দাঁড় করানো আছে।

মনু মামা সেই টাঙি তুলে নিয়ে মাটির ঘরের জানালার কাঠের গরাদগুলো ঝপাঝপ কোপ মেরে কেটে ফেললেন। সেই কালো-কোলো। গুবলু- গাবলু ভাল্লুকের বাচ্চাটাকে দু'হাতে তুলে ধরে সেই জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে গলিয়ে দেবার মতলব করলেন। মা ভাল্লুককে প্রাণে মারার কোনো ইচ্ছা ছিলো না তার।

বাচ্চা গলিয়ে দিতে চাইলেই কি গলে? বাচ্চাটা বেশ নাদুস-নুদুস ছিল, কিন্তু জানালার যা ফুটো তা দিয়ে বাচ্চাটাকে গলিয়ে ফেলা মুশকিল। অথচ বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়ে ভাল্লুক মা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠেছিল এবং সে তখন দু'হাতের নখ দিয়ে মাটির ঘরের দেওয়াল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভাঙতে আরম্ভ করলো।

অবস্থা বেগতিক দেখে মনু মামা জানালার গরাদের উপর এবং নিচের দিকের কিছুটা মাটি ঐ টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলে ভাল্লুকের বাচ্চার গলে যাবার মতো জায়গা হতেই তাকে সেই ফুটোতে বসিয়ে দু'হাতের মুঠো জড়ো করে, যেমনি করে লোকে ভলিবল খেলে, তিমনি করে জোরসে এক ধাক্কা মারলেন! ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন বাইরে তার থপ করে পপাতধরণীতলের আওয়াজ।

বাচ্চাটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী দৃশ্য তা ভোলবার নয়।

দৃশ্য অবশ্য ছোট মামা দেখেননি, তিনি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মনু মামার ধারাবিবরণী থেকে যেটুকু শুনেছিলেন, সেটুকুই আমাদের অত্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে এবং এক অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলতেন।

বচ্চাটি নিচে পড়তেই ভাল্লুক-মা দৌড়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। এক লাফে চার পায়ে সেই চন্দ্রালোকিত, ধূলি-ধূসরিত আলো-ছায়ার ডোরাকাটা পাহাড়ী গাঁয়ের পথে, বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যেতে লাগলো কুঁক কুঁক আওয়াজ করতে করতে। আর তার পাশে পাশে বন্দীদশা থেকে সদ্যমুক্ত বাচ্চাটি মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজী খেতে খেতে চলতে লাগলো।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তারা কিছুদূর পথ বেয়ে হেঁটে গিয়ে, পথ ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকে জানোয়ার-চলা সরু পথ দিয়ে চলে গেল কোথায় না কোথায় আলো-আঁধারে গা ছমছমে বনে।

৫.

তুমিও সব সময় গল্প করতে গিরিডির কথা। মামারা কেউ এলে ত কথাই নেই। শালবন, উশ্রী নদী, খাণ্ডুলী পাহাড়। উশ্রী নদীর তট, নদীতে পিকনিক, চাঁদনী রাতে। বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে বসন্তোৎসব, তোমাদের স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই হিমাংশু বাবুর কথা, বড় মামার কথা, গল্প করতে।

তোমার ছেলেবেলায় বড় মামার তখনও কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু তখনই তার কবি- প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছিল। তোমার পুরনো দাইয়ের কথা. তোমার যে একটা ছোট্ট শাদা পোষা-ভেড়া ছিল, সেই ভেড়াটার কথা। দাদুর কথা, দিদিমার কথা, সাঁওতালী গ্রামের শীতের রাতের মাদলের আওয়াজের কথা, তোমার কাছে সেইসব গল্প শুনতে শুনতে ছেলেবেলা থেকে কল্পনার জগতের যে চিত্রকল্প আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিল, সেইসব ছবি আমৃত্যু বয়ে বেড়াতে হবে আমাদের ।

বাবার স্বাধীন পেশা শুরু করার বছর তিন-চার পর একবার কোডারমা গেলাম আমরা সকলে মিলে। ক্রিশ্চান মাইকা কোম্পানির একটা অতিথিশালা ছিল শিবসাগরে। কোডারমা স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা গাড়িতে গিয়ে তবে মাইকা কোম্পানির চত্বরে পৌঁছানো যেত। ভারতীয় মালিক সবে ইংরেজ মালিকদের কাছ থেকে সেই কোম্পানি কিনেছেন। পেশার সূত্রে সেই মালিকদের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ ছিল। সেই অতিথিশালা, পাঁচ-নম্বর বাংলোটি কী যে চমৎকার ছিল!

একতলা মার্বেল মোজাইকের বাংলো, প্রায় দুশো বিঘে মতন নিয়ে তার হাতা, পিছনে শালবন, সামনে নুড়ি-ঢালা রাস্তা, কেয়ারী-করা ফুলের বাগান। বিকেল বেলা সহিস ঘোড়া সাজিয়ে আনতো আমাদের ঘোড়া চড়াবার জন্যে। শিকার যাত্রার জন্য একটা জীপ এবং একটা ওয়েপন ক্যারিয়ার সব সময় তৈরি হয়ে থাকতো, আর থাকতো দুটি প্রাইভেট গাড়ি।

বাবুর্চিখানার দেখাশোনার জন্যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, স্টুয়ার্ডের কাজ করতেন তিনি। লম্বা দাড়িওয়ালা মুসলমান বাবুর্চি। কী ভালোই যে রান্না করতো তারা।

বিকেলে চায়ের সঙ্গে হান্টি পামার বিস্কিট দিত। সে বিস্কিট তখন আসতো বিলেত থেকে। কত রকম স্বাদ ও

চেহারার যে হতো হান্টি পামার বিস্কিট তা যারা না খেয়েছেন তারা জানেন না।

তুমি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সারাদিন আনন্দে শালবনের দিকে তাকিয়ে থাকতে আর আমাকে বলতে, জানিস খোকন, আমাদের গিরিডির বাড়ির পিছনে যে শালবনটা ছিল ঠিক এইরকম দেখতে। সবুজ শালবন, কালো পাথর, টিয়ার ডাক, নীলকণ্ঠ পাখির নীল আকাশের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে উড়ে যাওয়া সব এক রকম।

বড় ভালো লেগেছিল তোমার কোডারমায় গিয়ে।

একদিন বিকেলে, মনে আছে, মেঘ করে এলো। এপ্রিল মাস। পয়লা বৈশাখের কাছাকাছি, আগে কি পরে মনে নেই। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল, তারপর ঝড় উঠলো, শুকনো পাতা উড়িয়ে ঘুরিয়ে নাচিয়ে। ঝড়ের পরেই নামলো বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা, তারপর না-বৃষ্টি, না-রোদ, না-মেঘ, না-আলো– সব মিলেমিশে কী এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় নৈসর্গিক দৃশ্য হল। সেকথা মনে পড়লে আজও আমার গায়ে আনন্দের কাঁটা দেয়! আমি আর তুমি পাশাপাশি বসে সেই আশ্চর্য অদৃষ্টপূর্ব দুর্লভ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

তুমি নিঃশ্বাস ফেলে বলতে, আহা! ভগবানের কি লীলা!

তুমি প্রায়ই বাবাকে বলতে তারপরে, অনেক তো তুমি বড়লোক হলে, বাড়ি করলে, গাড়ি করলে, এত কিছু করলে, এবার আমাকে বিহারের সাঁওতাল পরগনায় লালমাটি আর শালবনের মধ্যে একটা ছোট্ট বাংলো করে দাও। শেষ জীবন আমি সেখানেই কাটাবো।

বাবা বলতেন, এসব কবি-কবি ভাব রাখো তো। বাইরে বাড়ি মানেই খরচ। প্রত্যেক মাসে মাসে মালীর মাইনে মানি-অর্ডার করে পাঠানো। বাঙালি বোকারাই খালি বাইরে বাড়ি বানায়।

তুমি শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে, দাও না বাবা, আমার জন্যে না-হয় একটু খরচ করলেই।

বাবা বলতেন, ছেলেমানুষী করো না।

বাবা যা বলতেন, ঠিকই বলতেন, সে বিষয়ে কোনো ভুল ছিল না। তবে তুমি যা বলতে চাও তাও আন্তরিকতার সঙ্গেই বলতে।

অন্য দশজন মেয়ের মতো তুমিও জাগতিক ব্যাপারে অবুঝ ছিলে, বাবার মতো প্রাকটিক্যাল লোকের পক্ষে তোমার এই ইম্প্র্যাকটিক্যাল শখ পূরণ করা সম্ভব ছিল না।

এ-কথাটা আমার মনে ছিল।

বড় হবার পর আমি যখন নিজে রোজগার করতে আরম্ভ করি, ঘটনাচক্রে বিহারেরই শালবন, লালমাটি, কালো পাথরে-ভরা একটি স্বল্পখ্যাত জায়গায় একটি ছোট্ট বাংলোর খোঁজ পাই। সে বাংলোটি ছিল স্কচ্ সাহেবের। তিনি সেটি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানেই বসবাস করার ইচ্ছায়।

ছেলেবেলা থেকেই তোমার মুখে তোমার কল্পনার বাড়ির যে বর্ণনা শুনেছিলাম, পরিবেশের যে বর্ণনা শুনেছিলাম, তার সঙ্গে সেই জঙ্গল পাহাড়বেষ্টিত ছোট্ট জায়গাটির বড় মিল ছিল।

কিন্তু আমি তোমাকে আগে না দেখিয়ে সেই বাংলো কিনতে চাইনি।

একদিন যখন তোমাকে আর ছোট মাসিকে নিয়ে রাঁচী এক্সপ্রেসে ভোরবেলায় শীতের সকালে রাঁচীতে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে সে জায়গাটার দিকে রওনা হলাম, তখন থেকে তোমার আনন্দ আর কে দেখে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা রাঁচী শহর ছেড়ে লোহার ডাগার রাস্তায় পড়লাম। পথের পাশে কড়াইশুঁটির ক্ষেত, সর্ষে লেগেছে একদিকে, হলুদে হলুদ হয়ে গেছে মাঠ, কোথাও বা সরগুজা। দূরে কিতারীর ফিকে হলুদ-সবুজ ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। সকালের প্রথম রোদে রোদ পোয়াচ্ছে গাঁয়ের লোকেরা। লাটাখাম্বায় ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর শব্দ করে জল তুলছে কুঁয়ো থেকে লাল শাড়ি পরা দেহাতী মেয়ে।

তুমি বললে, আহা রে! যেন মনে হল গিরিডিতে এসেছি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা গাড়িতে যাওয়ার পর যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে লাল ধুলো মেখে সেই বাংলোর সামনে দাঁড়ালো, আমি বললাম, মা চলো, বলে, ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে সেই বাংলোটার মধ্যে তোমাকে নিয়ে গেলাম।

বললাম, দেখো মা, তোমার যদি পছন্দ হয়, তাহলেই কিনবো, নইলে কিনবো না।

তুমি দেখে বললে, আহা। কী ভালোরে খোকন! কিনে ফেল, কিনে ফেল! বড় ভালো লাগবে আমার।

সে বাংলোর দরদাম নিয়ে আরও একটু বিতর্ক করা যেত। তুমি বললে, আহা, সে বেচারীরা বিপদে পড়ে সস্তায় বিক্রি করে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে, এই সময় দর করিস না, এতে ভগবান পাপ দেবেন। ওরা বেশি তো চায়নি। ওরা যা চায়, তাই দিয়ে দে।

আমি বললাম, ঠিক আছে। তোমার কোথাই রাখবো।

সে বাংলো কেনা হল। বাবা নিজে গিয়ে থেকে দু-মাস বাংলো সারিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে দিলেন।

তুমি যখন সেখানে গিয়ে ছিলে, তখন বড় কষ্ট করেই ছিলে। তখন কোনো আসবাব কেনা হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা ছিল। অসুবিধা ছিল অনেক কিছুর। তখন একটা ন্যাড়াবাড়িতে যতরকম অসুবিধা থাকা সম্ভব। সবরকম অসুবিধা তুমি সহ্য করেছিলে। পরে সেই বাংলোতে যতটুকু আসবাবপত্র না-নইলে নয় মোটামুটি, জঙ্গলের মধ্যে তাই দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলাম। রান্নার লোকের বন্দোবস্ত ছিল। মালী ছিল। সবরকম মাঝামাঝি আরামের বন্দোবস্ত ছিল। অথচ তখন তুমি এতই অসুস্থ হয়ে পড়লে যে সাজানো-গোছানোর পর একদিনও তুমি সেখানে গেলে না।

তোমার মতো মায়েদের পক্ষে কোনোদিনও স্বার্থপর হওয়া তো সম্ভব হতো না। যখনই তোমাকে জোর করেছি, এবার যেতেই হবে, আমার সঙ্গে চলো, আমি যাচ্ছি, তখনই তোমার হাজার রকম অসুবিধা। কখনও বাবার শরীর খারাপ, কখনও ভাইদের শরীর খারাপ, কখনও কোনো বধূমাতা আসন্ন-প্রসবা, কখনও তোমার নাতি-নাতনির অসুবিধা হবে তুমি চলে গেলে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তোমার অসুবিধার শেষ ছিল না, তুমি সংসারের মধ্যে শেষ জীবনে এমনভাবে মমতার শিকড় ও সে শিকড়ের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছিলে, হয়তো নিজের অজানিতেই যে, তোমাকে সেই শিকড় এবং শিকল ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যাওয়াই এক সমস্যা ছিল।

অথচ তুমি সব সময়েই শেষের দিকে বলতে, আমার বড় কষ্ট হয় রে, ঘর-সংসার করতে ভালো লাগে না।

অথচ তোমার চরিত্রে এমন কিছু ছিল না যে তুমি সংসার ছেড়ে দাও, তোমার ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে খেতে পেল কি পেল না, এ নিয়েও তোমার চিন্তার অন্ত ছিল না। তারা কী খেলো এবং আদৌ খেলো কিনা এসব ছিল তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্বের ব্যাপার। বাড়িতে দাসদাসী যতই থাকুক না কেন। যদিও ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই অনেক বড় হয়ে গেছিলো, প্রত্যেকেই বিবাহিত, প্রত্যেককেই দেখার লোকজন ছিল, তবুও।

যদিও তুমি পাঁচ-সাত-দশ দিন না থাকলে বাবার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা ছিল না, কারুরই তেমন কিছু অসুবিধা ছিল না তুমি না থাকলে; কিন্তু তুমি না থাকলে কারুর যদি কিছু অসুবিধা হয়, এই ভেবে ভেবে তুমি নিজের জীবনে সুখ কখনও ছিনিয়ে নিতে পারলে না।

তুমিও চলে গেলে, আমার কাছে সেই বাংলোর আকর্ষণও বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল।

আমার ঘনিষ্ঠ অন্য কেউই জানে না। সেই জঙ্গল পর্ণকুটির কেনার ইতিহাস। কার ভালো লাগবে, কে গিয়ে থাকবে বলে তা কিনেছিলাম।

যখন দেখলাম, ঐ জঙ্গলে না-ডাক্তার, না-হাসপাতাল, না-তোমার শারীরিক অবস্থা এমন, যে তুমি সেখানে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারো, তখন থেকেই ভাবছিলাম যে, এই বাংলো রেখে লাভ কি?

তারপর তো তুমি হঠাৎ চলেই গেলে। মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে। তোমার চলে যাবার পর সে বাংলোর আর কোনো প্রয়োজন আমার কাছে ছিল না। তাই তা হস্তান্তর করে ফেললাম। হস্তান্তরের কারণও গোপনই রইল।

যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো বাংলোটিকে, সেই বাংলোর পরিবেশকে, ঝুমকো জবার গাছটিকে– যে গাছে হাজার হাজার জবা ফুটতো, সেই তুমিই যখন নেই, তখন ঐ বাংলোর কোনো দামই ছিল না আর আমার কাছে।

ছেলেবেলায় যখন আশপাশের বাড়ির মাসিমারা তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসতেন অথবা আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং তোমার সঙ্গে গল্প করতেন, তখন আমরা ছোটরা কাছে থাকি, তুমি তা একেবারেই পছন্দ করতে না।

অথচ এও মনে পড়ে না যে, তুমি কখনও বাইরের লোকের সামনে আমাদের বকেছ। চোখ তুলে আমার দিকে তাকালে তোমার চোখে কী লেখা আছে তা বুঝতে পারতাম এবং নিঃশব্দে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতাম কিংবা অন্য ঘরে। আমার মনে পড়ে না তুমি কখনো আমাকে মেরেছিলে। তোমার কাছে বকুনিও খুব বেশি খাইনি। না বকে, না মেরে, কি করে শাসন করতে হয়, তুমি তা ভালোভাবেই জানতে।

আমাদের বাড়িতে তখন রেডিও ছিল না, তখনকার দিনে রীতিমতো অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেই রেডিও থাকতো। আজকালকার মতো রেডিও, ট্রানজিস্টার, টিভি'র বহুল প্রচার হয়নি। হয়তো এত সস্তাও ছিল না। টাকার অঙ্কে হয়তো আজকের মতো দাম ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনে সেই টাকার অঙ্কের মূল্য ছিল বহু বহুগুণ বেশি।

দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ির সেই পিছনের মাঠে যখন মুসলমান ধুনুরী তার সবুজ চেক-চেক লুঙ্গি পরে হাঁটু গেড়ে বসে তূলো ধুনতো প্রিং-প্রিং করে শব্দ করে, আর তূলোর নরম হাল্‌কা আঁশ উড়তো হাওয়ায় হাওয়ায়, তখন মাঠের ঐ পাশের বাড়ি থেকে রেডিওতে কানন দেবীর গান ভেসে আসতো, 'হারা মরু নদী, ক্লান্ত দিনের পাখি'।

দুপুরবেলায় অনুরোধের আসর শুনতাম আমি, আমাদের পুবের জানালার তাকে বসে। এত আওয়াজ ছিল না তখন কলকাতায়। এত লোক ছিল না। এত ট্রাম, এত বাস, এত গাড়ি, এত ফেরিওলা কিছুই ছিল না। তখন অনেক দূরের কোনো বাড়িতে রেডিও বাজলেই সে আওয়াজ অতি সহজেই অন্য বাড়ি থেকে শোনা যেত।

মহালয়ার ভোরে পাড়াতে অল্পসংখ্যক রেডিও থাকা সত্ত্বেও শুধু আমাদের পাড়াই নয়, সমস্ত কলকাতা শহরই গম্‌গম্‌ করে উঠতো শ্রী শ্রী চণ্ডীর আরাধনায়।

একবার পূজোর আগে আগে, বোধহয় মহালয়ারও দিন সাতেক আগে দীপালির ভাই দিলীপ হঠাৎ বলল যে, ওর বাবা একটা রেডিও কিনেছেন।

কি কারণে মনে নেই আজ; ওর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হওয়াতে ও আমাকে বলল, ঠিক আছে আমার সঙ্গে তুই ঝগড়া করলি? আমাদের বাড়িতে রেডিও আসুক, তোকে আমি শুনতে দেবো না।

সে কথা তোমাকে বলতে তুমি বললে, তুমি ওদের বাড়ির রেডিও শুনতে চেয়েছো কেন? আর তুমি তো বোকা। যদি দোতলায় রেডিও বাজে, তুমি তো এমনিতেই একতলা থেকে শুনতে পাবে। এ নিয়ে অশান্তির কী আছে?

দিলীপের বাবা যদি রেডিও কেনেন, তবে আমার বাবা কেন রেডিও কিনতে পারেন না এই প্রশ্ন করেছিলাম তোমাকে।

তুমি প্রথমে এর কি উত্তর দেবে ভেবে পাওনি। তারপর বলেছিলে, সবাই কি সব কিনতে পারে? না সকলের

সব থাকে? তোমরা তো কত ভালো আছো খোকন। তোমাদের কত আত্মীয়-স্বজন, এই পাড়াতেই তোমার কত বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা তোমার চেয়েও অনেক অসুবিধায় থাকেন।

তুমি বলতে, সব সময় নিচের দিকে তাকিও। উপরের দিকে তাকাবার কোনো শেষ নেই। সেদিন কথাটা সামান্য শুনিয়েছিলে কিন্তু আজ বুঝি যে কথাটা আদৌ সামান্য ছিল না। তুমি আরও বলতে, যাদের সবই আছে, যাদের বাবা-মায়েরা যাদের সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন, তাদের নিজেদের তো করে নেবার মতো কিছু বাকি থাকে না। বেশ তো, তোমাদের অনেক কিছুই নেই, অন্যদের আছে। তুমি বড় হও, ভালো করে লেখাপড়া শেখো, তারপরে তুমি সবকিছু নিজে করে নেবে। নিজের জিনিস নিজে করবে, সেটা কত বড় আনন্দের কথা। বাবা এনে দিলে তো বাবাই দিলেন। তুমি নিজে করার আনন্দ কি বাবা কিনে দেওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বড় নয়?

বয়সের অনুপাতে সকলেরই আত্মসম্মান জ্ঞানটা বাড়ে না। তখন ঐ বয়সে অত কিছু বোঝার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, আজকে বুঝি যে, সেই সাধারণভাবে খেলার ছলে বলা কথাগুলি কত গভীর!

আমি আর আমার ক্লাস-থ্রির বন্ধু শিবু, দুজনে যখন স্কুল থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম জলযোগের সামনে দিয়ে, তখন প্রায়ই আমাদের একই আলোচনা হতো।

জলযোগের দোকানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা প্রকাণ্ড ছবি ছিল। হাতে-আঁকা, পাশে লেখা ছিল যে, তিনি পয়োধি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছেন।

শিবু বলতো, এরচেয়ে বাজে কথা হতেই পারে না।

আমি বলতাম, কেন?

শিবু বলতো, অত বড় দাড়ি-গোঁফ নিয়ে কেউ কখনও দই খেতে পারে? সমস্ত দই তো গোঁফে-দাড়িতেই লেগে যাবে।

আমি ওর কথায় ভীষণ চিন্তায় পড়ে যেতাম।

এছাড়াও আমরা যে-বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করতাম, তা হল হঠাৎ যদি আমাদের কেউ অনেক টাকা দিয়ে দেয় অথবা লটারিতে টাকা পাই, তাহলে জলযোগে ঢুকে আমরা কোন্ কোন্ মিষ্টি খাবো। আমার সঙ্গে শিবুর রসগোল্লা সম্বন্ধে মত মিলতো, আর কোনো ব্যাপারেই মিলতো না।

শিবু বলতো, মিছিমিছি আলোচনা করে কী লাভ বল? টাকা পেলে তবে তো খাবো? যতদিন না পাচ্ছি, ততদিন আর এমনি এমনি আলোচনা করে লাভ নেই। কাল থেকে, বুঝলি, আর আমরা ডানদিকের দোকানে তাকাবোই না। কিন্তু আবার পরদিন সেই একই আলোচনা আমাদের করতে দেখা যেত।

আমার বড় পিসেমশাই যখন আসাম থেকে আসতেন কলকাতায় এবং আমাদের বাড়িতে উঠতেন, তখন আমাদের খুব আনন্দ হতো।

বড় পিসেমশাইয়ের অবস্থা খুব ভালো ছিল। কিন্তু অবস্থা ভালো থাকলেই মানুষের মন বড় হয় না। পিসেমশাই কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন। এমন আমুদে হাসিখুশি, এমন দরদী ছিলেন যে, তাঁকে ভালোবাসতো না এমন কেউই বোধহয় ছিল না।

আমার ছোট পিসেমশাইও কলকাতায় থাকতেন এবং যখনই তাঁর তখনকার বেহালার বাড়িতে যেতাম, আমাদের বড়ই আদর-যত্ন করতেন। নিজে বাজারে যেতেন আমাদের জন্যে। ছোট পিসিমার অনুপাতের জ্ঞানটা কম ছিল। একসঙ্গে আটটা-দশটা ডিম দিয়ে ওমলেট বানিয়ে বলতেন, ছেলেমানুষ! খেয়ে ফ্যাল। এই অনুপাত জ্ঞানের অভাবেই একবার ছোট পিসিমার প্রাণ সংশয় হয়েছিল। ভালো ফল হওয়ার জন্যে একসঙ্গে দশটি জোলাপের বড়ি খেয়ে ফেলে তাবৎ আত্মীয়-স্বজন মহলে খবরের সৃষ্টি করেছিলেন একবার।

বড় পিসেমশাই যেহেতু এখানে থাকতেন না, উনি এলে যেন বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত।

তুমি কোন সিনেমা দেখতে যাবে, বাবা চিতলমাছের পেটি ভালোবাসেন, না কই মাছ? আমরা কে কী খেতে ভালোবাসি, এইসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বড় পিসেমশাই আমাদের কলকাতার নিস্তরঙ্গ জীবনে বিরাট ঢেউ তুলতেন।

যেবার প্রথম আমরা বড় পিসিমার বাড়িতে যাই আসামে, সেকথাও পরিষ্কার মনে আছে। তার পরেও বহু বহুবার গেছি সেখানে, সেই প্রথমবারের যাওয়ার কথা বোধহয় কোনোদিনই ভুলবো না। বাবা কাজের জন্য যেতে পারেননি। আমরা একাই গিয়েছিলাম।

পার্বতীপুর জংশন, বিরাট বড় জংশন। সে স্টেশনে গাড়ি বদল করে, উত্তরবঙ্গ পেরিয়ে আসামের পরে কোক্‌রাঝাড় বলে একটা ছোট্ট ঘুমন্ত স্টেশনে আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। সিমেন্ট বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম নয়, খোয়ার প্ল্যাটফর্ম। এক শীতের শেষ বিকেলে সেই জঙ্গলবেষ্টিত ছোট্ট স্টেশনে লাল পাড়ের কালো শাল গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, অল্প-ঘোমটা টানা তোমার সুন্দর মুখের ভাবটি আজও আমার মনে আঁকা আছে। মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে স্টেশন, স্টেশন মাস্টারের ছোট্ট ঘর, তাতে টিম্‌টিম্ করে লণ্ঠন জ্বলছে। স্টেশনের পাশেই ছোট্ট লেভেল-ক্রসিং। ধূলি-ধূসরিত কাঁচা রাস্তা চলে গেছে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে। বিরাট বিরাট শাল আর সেগুনের গাছ, আরও কত নাম-না-জানা গাছ, জার্মান জঙ্গলের গায়ের কটু ও উগ্র গন্ধ শীত-সন্ধ্যার সেগুন গাছের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশেছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল মোষের গাড়ির মোষের গায়ের গন্ধ।

আমরা যেতেই পিসেমশাই যে মোষের গাড়ির সঙ্গে গাড়োয়ান এবং অন্য একজন লোককে আমাদের আনতে পাঠিয়েছিলেন, তারা হৈ হৈ করে এসে আমাদের মালপত্র সব তুলে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলল। মোষ জোড়া হল গাড়িতে। ছইয়ের নিচে মোটা করে খড় পাতা, তার উপরে বিছানা বিছানো। পায়ের উপর বিছিয়ে রাখা কম্বল। গাড়ির পেছন দিকে গাড়ির নিচে লণ্ঠন ঝুলছিল একটা, আর ছইয়ের উপর থেকে আরেকটা লণ্ঠন জ্বলছিল ভিতরে।

গাড়ি চলতে শুরু করলো। এক ডেক্‌চি ভর্তি ডিম সিদ্ধ, আর এক ঝুড়ি আসামী কমলালেবু– পথের খোরাকি হিসেবে সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন পিসেমশাই। আমরা নুন-গোলমরিচ দিয়ে ডিমসিদ্ধ আর কমলালেবু ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেতে খেতে অন্ধকার জঙ্গলের পথ দিয়ে চললাম তামাহাটের দিকে।

কাঁচা লালমাটির পথ দিয়ে ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর করে চলতে লাগল মোষের গাড়ি। সে কী গভীর বন। দিনমানেই অন্ধকার থাকে।

যেতে যেতে পথে একটা সরু নদী পড়লো। জল থেকে ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। জলজ গন্ধ, আর নদীর কুলকুল্ আওয়াজ বনপথ ভরে রেখেছিল। মোষের গাড়ি তার উপর দিয়েই পার হবে বলে নেমে পড়ল। নদীতে সবে গাড়িটা নেমেছে এমন সময় মোষ দুটো ভীষণ জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে শিং নাচিয়ে উঠলো।

গাড়োয়ান হঠাৎ বলে উঠল, বাঘ, বাঘ!

গাড়োয়ানের সাগরেদ যে ছোকরা তার পিছনেই বসেছিল সে বলল, মেলা বাঘ!

আমরা ছইয়ের মধ্যে দিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে দেখি, নদীর ডানদিকে যেখানে ছায়া আরও ঘন, সেখানে দুটি বিরাট বিরাট লাল লাল গোল গোল চোখ মোষ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

সঙ্গের সেই লোকটিও গাড়োয়ান কী সব দুর্বোধ্য ভাষায় খুব জোরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

আমাদের বলতে হল না, আপনা থেকেই গলা দিয়ে যেন নানারকম কম্পমান সুর বেরিয়ে আসতে লাগলো বিভিন্ন গ্রামে।

মোষ দুটো নাকে ভোঁস্ ভোঁস্ করে আওয়াজ করতে লাগলো আর তাদের বিরাট বিরাট শিং দুটো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মাথা এদিক-ওদিক করতে লাগলো। গাড়ি থেকে মোষজোড়া ছুটে যায় আর কি!

কিন্তু সেই লাল চোখ দুটো একটুও নড়ল না। যেখানে ছিল, সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ পরে মনে নেই, আস্তে আস্তে সেই চোখ দুটো নদী ছেড়ে উঠে ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

রাতের কোন্ প্রহরে যে গিয়ে পৌঁছলাম, সেকথা এখন আর মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় সন্ধ্যেরাতকেই গভীর রাত বলে মনে হয়। তবে একথা পরিষ্কার মনে পড়ে যে, ভোরবেলা থেকে এক নতুন অনাবিল প্রাকৃতিক জগতে প্রবেশ করলাম।

৭.

তুমি যেন সংসারের জোয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে কেমন অন্যরকম হয়ে যেতে। তোমার চোখের ভাব স্নিগ্ধতর হয়ে উঠত, সব সময় তুমি হাসতে আর আমাদের বলতে, খোকন, তোমরা বেশি দুষ্টুমি করো না যেন।

পিসেমশাই ও পিসিমা আদর-যত্নের কোনই ত্রুটি রাখতেন না। সকালবেলায় আমাদের প্রাতঃরাশ হতো ক্ষেতের চালের সুগন্ধী ফেনা ভাত ডিমসিদ্ধ ও আলু দিয়ে। তারপর বেরিয়ে পড়তাম এদিক ওদিক।

কলকাতার শিশুর জন্যে আসামের সেই গোয়ালাপাড়া জেলার ছোট্ট অখ্যাত গ্রামটিতে যে কত-না-কত আশ্চর্য এবং ভরন্ত ভালোলাগা অপেক্ষমাণ থাকতো, সেকথা আজকে মনে করে অভিভূত বোধ করি।

সেই তামাহাট গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে গঙ্গাধর নদী, তিস্তার সঙ্গে যার যোগ ছিল। নদীর পারের মাঠ, ঝোপ-ঝাড়, গাছ-গাছালি, পাখির ডাক, রাখাল ছেলের বাঁশীর তান সব যেন স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে হলুদ ফিন্‌ফিনে প্রায় স্বচ্ছ ডানায় রোদ চমকানো ফড়িংদের ঝাঁক বেঁধে ওড়া, মনে পড়ে নদীর জল থেকে সাঁতরে উঠে উদবেড়ালদের অন্য পারের বালির উপর শরীরের জলের ছাপ রেখে গর্তের মধ্যে ভিজে শরীরে আস্তে আস্তে ঢুকে যাওয়া।

নদীর মধ্যে বিরাট বিরাট চর ছিলো। শীতকালে সেই চরে বেদেরা ঘর বেঁধে থাকতো। চিতাবাঘে এসে তাদের গরু, ছাগল, বেতো ঘোড়া কখনও সখনও নিয়ে যেতো। নরম সাদা ফুলঝুরির মতো কাশের বন, ধূ ধূ– সাদা দুধলী ঘাস, নীল আকাশ, আর তার পটভূমিতে গাঢ় নীল হিল্লোলিত প্রবহমান জলরাশি– সব মনে পড়ে।

পিসিমার বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ছিলো বিরাট বাগান, চাপ চাপ ঘন-সন্নিবিশিষ্ট কচি কলাপাতা, সবুজ ঘাসের মাঠ। রঙ্গন, কাঠ টগর, সজনে, হলুদ, রাধাচুড়ো এবং ঝুমকো জবার ডালে বসে টুনটুনি, বুলবুলি, রং-বেরঙের মৌটুসী পাখিরা সকাল থেকে ফিস্‌ফিস্ করে কতো কি বলতো।

খাটাশ এসে হানা দিতো মাঝে মাঝে, পাখির বাচ্চা ধরতো বাগানের গাছে উঠে, নয়তো মুরগির খাঁচা থেকে মুরগি নিয়ে পালিয়ে যেতো।

সপ্তাহে একদিন করে হাট বসতো তামাহাটে। সপ্তাহের কোন দিন তা আজ মনে নেই। সেই হাটের কথা এ জীবনে ভোলার নয়। সকাল থেকে গরুর গাড়ি এসে জমা হতো দূর দূর গ্রাম থেকে। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে আসতো কমলালেবুর ঝুঁড়ি আর মহাশোল মাছ। সে মাছের যেমন চেহারা; তেমন স্বাদ। বড় বড় আঁশ, পাথালি করে রাখলে গরুর গাড়ির এপাশ-ওপাশ ভরে যেতো এক একটা মাছে।

বেতো ঘোড়ায় চেপে আসতো দূরের বাগডোগরা গ্রাম থেকে মুনসের মিঞা। গ্রামের মোড়ল। তার লাল-সাদা ঘোড়াটিকে সে পিসেমশাইয়ের গদিঘরের বারান্দার খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখতো। মুনসের মিঞার সাদা দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপি, পরনে কুর্তা আর লুঙ্গি। সে এসে গদিঘরের দাওয়াতে বসে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করতো আর আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে সেসব গল্প শুনতাম। তার কথার মধ্যদিয়ে এক সম্পূর্ণ অজানা

অনামা জগতের ছবি আমার মগজে এসে বাসা বাঁধতো।

সারা দুপুর হাটের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম। নরম খড়কুটো মেশা ধুলোর গন্ধ, চাষাদের গায়ের গন্ধ, কেরোসিন তেলের গন্ধ, ঝোলা গুড়ের গন্ধ, মাছের গন্ধ, পাঁঠার গায়ের গন্ধ, গরু-মোষের গায়ের গন্ধ, ঝাল-বিস্কুটের গন্ধ, মুড়ির গন্ধ, চিড়ের গন্ধ, নতুন চালের গন্ধ, গন্ধে গন্ধে গন্ধময় হয়ে উঠতো সমস্ত দুপুর।

তারই মধ্যে আসতো একটি দুটি মোটর ভ্যান, বিড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপন অথবা টর্চের ব্যাটারির বিজ্ঞাপন করতো তারা চোঙা-বসানো কলের গান নিয়ে। গান বাজতো উচ্চগ্রামে। সেকালের ফিল্মের গান। সেসব গান আজকাল সেই দুপুর বেলার হাটের মিশ্র গন্ধের মতোই তামাদি হয়ে গেছে। সে গান আর কেউই গায় না। সেসব গান আর কারো মনে নেই।

কোনো কোনো দিন পিসেমশাই তার বন্দুক নিয়ে আমাদের সকলকে সঙ্গে করে গঙ্গাধর নদী বেয়ে নৌকায় করে চলে যেতেন তিস্তার কাছে। সেখানে তিস্তাটা কি সুন্দর! শীতের তিস্তা আর শাখা-প্রশাখা, কাচের মতো স্বচ্ছ পানি, তার নিচে নানা রঙের, নানা আকারের নুড়ি, আর সোনারী রঙের চরের পাশে বসে থাকা লাল-মাথা, রেড-হেডেড পোচার্ড হাঁস। কোথাও বা চখাচখির ঘন সোনালী রঙে আকাশ সোনালী হয়ে যেতো। অন্যদিকে কালো-সাদা রাজহাঁসের দল কোঁয়াক্ কোঁয়াক্ আওয়াজ করে তাদের ধীর মন্থর শ্লথ উড়াল ঢঙে কোন অজানা দেশের পানে পাড়ি দিত।

একবার মনে আছে আমরা গেছিলাম বৈশাখ মাসে। আলোকঝাড়ি পাহাড়ে সাত বোশেখীর মেলা বসে। তামাহাট থেকে অনেক দূরে সে মেলা। ভোরের বেলা গরুর গাড়িতে চেপে গেলে মেলা দেখে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। আমরা সকলেই গেছিলাম। মনে আছে, তিনটি গরুর গাড়ি বোঝাই করে। গরুর গাড়ির উপরে খড় বিছানো, তার উপরে শতরঞ্জি পাতা, মাথার উপর ছই দেয়া।

আস্তে আস্তে কুমারগঞ্জে পোঁছে, কুমারগঞ্জকে ডানদিকে রেখে আমরা বাঁদিকে টুঙবাগান পেরিয়ে রাঙামাটি হয়ে আলোকঝাড়ির পাহাড়ে উঠতে লাগলাম।

জঙ্গলের রূপ যে বিভিন্ন ঋতুতে কত বিভিন্ন তা সেই ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করে আসছি। বৈশাখ মাসে সব গাছের পাতা ঝরে গেছে, সমস্ত জঙ্গল বাঘের গায়ের মতো লাল, পত্রহীন শাখা-প্রশাখার কালো ডোরাকাটা। পোড়া পাতা, ঝরা পাতা, শুকনো পাতা পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। দুপুরে অলস মন্থর হাওয়া মচ্মচানি তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে সে পাতাদের একবার এপাশে একবার ওপাশে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়ায় সেই পাতারা কোন এক অদৃশ্য দেবতার প্রতি যেন তাদের আরতি জানাচ্ছে ঘূর্ণায়মান উৎসারিত শরীরে। আরতি শেষ করেই আবার নেমে আসছে ধরিত্রীর বুকে।

মেলার পথেই, মনে পড়ে, দেখেছিলাম, একটি সম্পূর্ণ পত্রশূন্য গাছে লাল মুরগির ঝাঁক বসে আছে। যেন পলাশ ফুল ফুটে আছে কতো।

হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, একটি লাল রঙের কোটরা হরিণ পথের বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে চলে গেলো দুটো গরুর গাড়ির মাঝখান দিয়ে।

আমরা সব হৈ হৈ করে উঠলাম।

ভর দুপুরে যখন মেলায় গিয়ে পোঁছলাম, তখন যে কি আনন্দ। যতদূর চোখ যায় হলুদ রঙের ছোপানো কাপড় পরে আদিবাসী মেয়ে-পুরুষরা এসেছে পুজো দিতে। পায়রা বলি দিচ্ছে, পাঁঠা বলি দিচ্ছে; লাল জঙ্গলের পটভূমিতে কালো পাথরের উপরে।

কুল্ কুল্ করে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না, তাতে এখন জল কম, বালি বেশি। সেই ঝর্নার পাশে পুজোর পর পুজো চড়ছে। সেই মেলাতে বিকিকিনিও হচ্ছে কম নয়। পাহাড়ী উপজাতি ম্যাচরা তাদের বাদামি শরীরে, বাদামি চুলে কাঠের কাঁকই গুঁজে তাদের হাতে বোনা তাঁতের রং-বেরঙের পোশাক পরে অনেক কিছুই নিয়ে এসেছে

সেই মেলায়।

গারো পাহাড়ের পাহাড়তলীর কুমির-ভরা জিঞ্জিরাম নদীর অববাহিকা থেকে এসেছে রাভা উপজাতিরা। তারা না জানি কোন না কোন পথ বেয়ে সেই জঙ্গলে এসে হাজির হয়েছে তাদের যা কিছু কেনা-বেচার জন্য। তীর-ধনুক হাতে আদিবাসী চিকন চেহারার চ্যাটালো বুকের ছেলেরা এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পেছন পেছন চলেছে তাদের বশংবদ লাল বা কালো রঙের ছুঁচলো-মুখ দিশি কুকুর।

জনসমাগমে গম্‌গম্‌ করে আওয়াজ উঠেছে। দূর থেকে মনে হয়, কোনো প্রচণ্ড জলপ্রপাত বুঝি। মেলায় যেখানে ভিড় খুব বেশি সেখান থেকে সরে এসে একটি দোলা মতো জায়গায়, যেখানে গ্রীষ্মের দাবদাহতেও ছায়া ছিলো নরম নিভৃত, ঝর্না ছিল এক ফালি, সেখানে বসে চড় ইভাতি করলাম আমরা। মা, পিসিমা আরও কে কে যেন মিলেমিশে খিচুড়ি রান্না করলেন, সঙ্গে বেগুনি ও কড়কড়ে আলুভাজা। আমরা ছেলেমেয়েদের দল হৈহৈ করে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

ঘাস থেকে পাথর তুলে দেখি, তার নিচে শঙ্খচুড়ের বাচ্চা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চারদিকে। অন্য পাথরের ফোঁকরে ছিলো মেঠো ইঁদুর। কি নরম পেলব সাদা তাদের চেহারা। নতুন চালের গন্ধ তাদের গায়ে। আদিবাসীরা দেখতে পেয়ে ফটাফট্‌ ধরে ধপাধপ্‌ পাথরে আছাড় মেরে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে নিয়ে নুন দিয়ে খেয়ে ফেলল।

কত কি অ্যাডভেঞ্চার, কত কি খেলা চারদিকে ঘিরে ঘিরে।

মাঝে মাঝে তুমি ডাক দিতে। বলতে, সাবধান খোকন, গরমের দিন, সাপ আছে। এইতো কতো বাচ্চা বেরুলো। পিসিমা বলতেন, বাঘের দেখা; সাপের লেখা। সাপ থাকলেও কি কেউ দেখতে পায়; সাপে কামড়ানো যদি কপালে থাকে তো কামড়াবেই।

তুমি বলতে, না বাবা, আমার ছেলেকে সাপে কামড়িয়ে দরকার নেই।

যখন ফিরে আসছিলাম আমরা, তখন পশ্চিমদিকে সূর্য ঢলে পড়েছে। টুঙ্‌ বাগানের মধ্যে ছায়াছন্ন রাস্তা, বিরাট টুঙ্‌ জঙ্গলটা সবসময় স্যাঁতস্যাঁতে ছায়ানিবিড় হয়ে থাকে। নিচে নিচে ঢেঁকির শাকের মতো ঘন সবুজ ফার্ন, শ্যাওলা, গোপন ঝর্নার ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ, কট্‌কটি ব্যাঙের অস্ফুট কট্‌কট্‌ আওয়াজ ভয় ভয়,শীত শীত সমস্ত পরিবেশটা।

সন্ধ্যার ঠিক মুখোমুখি একটা চিতাবাঘ পড়লো আমাদের সামনে। গরুর গাড়ির গরুরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, গাড়োয়ানরা তাদের বিচিত্র সব দেশজ আওয়াজ করে গরুর ল্যাজ ধরে টানাটানি করে, ফটাফট্‌ পাচন-বাড়ি পিঠে মেরে সাঙ্কেতিক ভাষায় গরুদের বুঝিয়ে দিলে যে, ভয় নেই; সোজা চলো।

অতএব তারা সোজাই চললো।

তামাহাটে ফিরে আসতে আসতে রাত্তির। সবে আমরা গদিঘর দিয়ে ভেতরে ঢুকেছি, এমন সময় গুড় ম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম।

পিসেমশাই চোখে কম দেখতেন। বাড়ির চাকর সন্ধ্যার আগে আগে মুরগির খাঁচার দরজা বন্ধ করেছিল। এমন সময় তার চোখে পড়ল বন-বেড়ালের মতো একটা কি যেন অন্ধকারে খাঁচার মধ্যে মুরগিদের সঙ্গে লাজুক বরের মতো বসে আছে। আর মুরগিগুলো প্রচণ্ড লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে। তাই না দেখে সে পিসেমশাইকে গিয়ে খবর দিলো। পিসেমশাই একে চোখে ভালো দেখতেন না, তার উপর অন্ধকার হয়ে গেছে। বন্দুকটা নিয়ে এসে উনি চাকরকে বললেন, তুই লণ্ঠনটা তুলে ধর, আমি এক গুলি মেরে দিচ্ছি। কাল সকালে দেখা যাবে কতো বড় বন-বেড়াল। গুলি মেরে দিচ্ছি বলেই পিসেমশাই গুলি করে দিলেন। সেই গুলির আওয়াজের শব্দই আমরা পেলাম ঢুকতে না ঢুকতেই। গুলি করার পর চাকর বাইরে থেকে খাঁচা বন্ধ করে দিলো।

সে রাতে উত্তেজনায় আমাদের কারোরই ঘুম হলো না। বন-বেড়াল, সে নাকি কি জিনিস? তার কথা তো খালি বইয়েই পড়েছি, কখনও চোখে দেখিনি।

ভোরের প্রথম পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পড়লাম। তখন সবে দেওয়ালের টিনের ফুটোফাটা দিয়ে নরম আলো ঘরে এসে পড়েছে। দরজা খুলে হাত-মুখ না ধুয়েই দৌড়ে গেলাম পাট-বোঝাই গুদামঘরের পাশে সেই মুরগির খাঁচায়। পাটের গন্ধটা ভারি মিষ্টি লাগতো নাকে। পরশও ভারি আরামের ছিলো, রেশমী নরম। গিয়ে দেখি, বন-বেড়াল কোথায়? বিরাট এক চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে খাঁচার মধ্যে। আর মুরগিগুলো বাঘটাকে একঘরে করে ভয়ে সিঁটিয়ে একটার উপর আরেকটা হয়ে এক কোণায় জড়ো হয়ে আছে।

দৌড়ে গিয়ে আমি ধাক্কাধাক্কি করে সমস্ত ঘরের লোকদের তুললাম।

পিসেমশাই বেরিয়ে এসে বললেন, বলিস কি রে! চল তো দেখি। ততক্ষণে বাড়িসুদ্ধ সকলে এসে খাঁচার সামনে জড়ো হয়েছেন, কেউ কেউ বললেন, খবরদার। খাঁচার দরজা খুলবি না। বাঘ কি অত সহজে মরে? কোথায় না কোথায় লেগেছে। ও মরার ভান করে আছে।

পিসেমশাই বললেন, ও মরে ভূত হয়ে গেছে। দেখছো না শরীরটা কিরকম শক্ত হয়ে গেছে।

পিসিমা বললেন, শক্তই হোক আর নরমই হোক, তুমি মোটে ওর কাছে যাবে না,আর বাচ্চাদের এখান থেকে সরাও।

পিসিমার বকাবকিতে আমরা সবাই খাঁচার কাছ থেকে সরে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। পিসেমশাই বন্দুক নিয়ে এসে তাকে দুটো গুলি পুরে খাঁচার পাশে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর চাকর, তার নাম গেছি ভুলে; সে খাঁচার দরজা খুললো।

পিসেমশাই বললেন, ব্যাটাকে লেজ ধরে টান। লেজ ধরে বের করে নিয়ে আয়।

সে বলল, বাবু লেজ ধরলে তো খাবে আমাকে। ওর মধ্যে আমি নেই। আমার গলায় চারটে ফোঁড়া হয়েছে। বড় ব্যথা। বাঘ গলা কামড়ে ধরলে যন্ত্রণাতে মরে যাবো।

তখন পিসেমশাই বললেন, তুই কি বন্দুক ছুঁড়তে জানিস?

চাকর বললো, কোনোদিনও ছুঁড়িনি, গুলতি ছুঁড়তে জানি, ইট ছুঁড়তেও।

তখন পিসেমশাই তাকে পাঠালেন বৈদ্য কাকুকে ডেকে আনতে।

হাটের অন্যদিকে বৈদ্য কাকুদের বাড়ি। তিনি এলেন। খালি গায়ে, ঘুম থেকে উঠে চোখে কেতুর নিয়েই সোজা বিছানা ছেড়ে চলে এলেন বাঘ সন্দর্শনে। সাদা ধূতি পরে কালো সাঁওতালের মতো শ্যামলা চেহারার বৈদ্য কাকু এবং এসেই সোজা পিসেমশাইয়ের জায়গায় বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালেন।

পিসেমশাই নিজেই চিতাবাঘের ল্যাজ ধরে টেনে খাঁচা থেকে বের করতে গেলেন। কিন্তু অতবড় ভারি চিতাবাঘ কি পিসেমশাই একা টেনে বের করতে পারেন? জোরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই পিসেমশাই নিজেই পড়ে গেলেন। তখন আমরা সবাই মিলে হো হো করে হেসে উঠলাম আর মা-পিসিমার বকাবকি অগ্রাহ্য করে আমরাও দৌড়ে গিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে চিতাবাঘের ল্যাজে হাত দিয়ে তাকে হেঁইও করে টেনে বের করলাম। আমাদের হাতে অনেকক্ষণ বাঘের গায়ের গন্ধ লেগে রইল। সেই যে বাগডোগরা গ্রামের মুনসের মিঞা, সে একদিন এসে খবর দিল যে, তাদের গ্রামে একটা চিতাবাঘ খুব দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। আজকে গরু নিচ্ছে, কাল ছাগল নিচ্ছে, আবার কোনদিন মানুষ নিয়ে টানাটানি করবে।

পিসেমশাইকে বললে যে, কত্তা আপনি চলেন।

পিসেমশাই বললেন, আমি চোখে দেখি না, রাতের বেলায় কি আমি সে বাঘ মারতে পারবো? তার চেয়ে

মুনসের তুমি রতু দাদাকে নিয়ে যাও।

পিসেমশাইর পাশের বাড়িতে থাকেন রতু জ্যেঠু। পিসেমশাইয়ের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তার একটা ছোটোখাট কারখানা মতো ছিলো। তিনি জানতেন না এ হেন হাতের কাজ নেই। পেটা মজবুত চেহারা, ধূতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরতেন। খালি গা, সবসময় কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

তার বড় ছেলের নাম ছিল এককড়ি! আর পিসেমশাইয়ের দাদার ছেলের নাম ছিল তিনকড়ি। আমাদের কড়িদা।

কড়িদা আমার চেয়ে বয়সে সামান্যই বড় ছিলে। আমার বন্ধুর মতো। কড়িদার মতো অমন নরম, হাসিখুশি, পরোপকারী ভালো মানুষ আমি আমার জীবনে দেখিনি। কি আশ্চর্য! পৃথিবী বোধহয় ভালো মানুষদের ধরে রাখতে পারে না। নইলে তুমি চলে যাওয়ার আগেই আমাদের সমবয়সী হলেও কড়িদা কেনো এত বছর আগে হাসতে হাসতে হঠাৎ চলে গেলো! যারা সবচেয়ে ভালো, যারা থাকলে এই কুচক্রী কুটিল পৃথিবী মানুষের বসবাসের পক্ষে অনেক সহনীয় হতো, তারাই কেনো যে আগে চলে যায় তাড়াতাড়ি বুঝি না।

রতু জ্যেঠু বললেন, বাঘ মারবে? চলো।

পিসেমশাই, সেহেতু তার বন্দুকটাও আমাদের দিলেন। তার আগে বন্দুক চালানো একটু আধটু শিখেছি। কিন্তু বাঘ? ওরে বাবা!

রতু জ্যেঠুর থারটিএইটট মডেলের একটা ভি-এইচ হুড-খোলা ফোর্ড গাড়ি ছিল। সেই গাড়িতে চড়ে আমি, রতু জ্যেঠু আর কড়িদা একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর চললাম বাগডোগরা গ্রামের দিকে। মাঠ পেরিয়ে হাট পেরিয়ে চষা ক্ষেত পেরিয়ে, অনেক অনেক ধুলো উড়িয়ে বিকেল বিকেল আমরা এসে পৌঁছলাম বড় বড় গাছ ঘেরা ছোট্ট একটি গ্রামে। বাগডোগরা গ্রামে।

মুনসের সর্দার বড় খাতির করলো আমাদের। বড় বড় কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি পেতে দিলো বসতে। কি খেতে দেবে, কি করে আমাদের আদর করবে সে ভেবেই কূল পেল না। বললো, একটা বড় সাদা পাঁঠা বেঁধে রেখেছে ঝাঁকড়া আমগাছের নিচে, বাঘের চলাচলের রাস্তায়। সন্ধ্যা বেলার আগে সেই আম গাছে বসলে বাঘের সঙ্গে মোলাকাৎ নিশ্চয়ই হবে।

রতু জ্যেঠু সঙ্গে তার একনলা বন্দুক এনেছেন, তিনি অনেক বাঘ মেরেছেন। বাঘ, চিতা, কুমির। শিকারী বলে সে অঞ্চলে তার খ্যাতি ছিলো।

তিনি বললেন, দ্যাখ ছোকরারা, কথা কইবিনি। যেমন বসতে বলবো, চুপচাপ তেমন গাছের ডালে বসে থাকবি। বাঘ মরে গেলে যখন বলবো, তখন গাছ থেকে নামবি! হিসি-ফিসি করতে হয়তো এখনই করে নাও। জল খেতে হয়তো তা-ও। গাছের ডালে বসে নট নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু। মশা কামড়ালে মারতে পারবে না। কান চুলকোলে কানে হাত দিতে পারবে না, একেবারে স্ট্যাচু হয়ে থাকতে হবে।

তখন বাঘ শিকারের উন্মাদনা। আমি আর কড়িদা বললাম, নিশ্চয়ই জ্যেঠু, নিশ্চয়ই জ্যেঠু, আপনি যা বলবেন, তাই-ই করবো।

আমার কাঁধে গুলির থলি, তাতে ভর্তি গুলি। কড়িদার হাতে বন্দুক, কথা ছিল বাঘ এলে এবং জ্যেঠুর অনুমতি পেলে কড়িদা আমাকে আগে মারতে দেবে। তারপরও যদি গুলিখেকো বাঘ না মরে, তাহলে কড়িদাও গুলি করবে।

আমরা শোভাযাত্রা করে সেই আমগাছের দিকে চললাম। রতু জ্যেঠু প্রথমে পাঁঠাটাকে ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁঠার পেছনে জোরে একটা লাথি মারলেন। পাঁঠাটা মুখ দিয়ে একটা কুঁক আওয়াজ করলো শুধু কিন্তু ব্যাঁ বলে ডাকলো না। রতু জ্যেঠু বললেন, ব্যাটা জ্বালাবে।

মনসুর মিঞাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্টকে অন্য পাঁঠা আছে?

মনসুর মিঞা বললেন, পাঁঠা যাকে বাঘ দিয়ে খাওয়ানো যায়, সেরকম এটা আর আপাতত নেই।

রতু জ্যেঠু আগে গাছে উঠলেন বন্দুকটা আমাদের হাতে দিয়ে। উনি কিছুটা ওঠেন আর বন্দুকটার নল ধরে টেনে ওঠান। এই করে করে উনি বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে একটা জুঁৎসই ডাল দেখে অন্য ডালে হেলান দিয়ে বসলেন আসন করে। কড়িদাও তড়তড় করে উঠে গেলো। গ্রামের ছেলে। সে। উঠে গিয়ে সে-ও ভালো জায়গায় গিয়ে বসলো। আমি বন্দুকের কুঁদো ধরে উঁচু করে নলটা এগিয়ে দিলাম কড়িদার দিকে। কড়িদা নল ধরে টেনে নিয়ে বন্দুকটাকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর আমার ওঠার পালা।

যদিও ছেলেমানুষ, শরীর ছিপছিপে; কিন্তু শহরের ছেলে। গাছে ওঠার অভ্যাস নেই। নিচ থেকে মুনসের মিঞা আমাকে বস্তার মতো ঠেলে দিতে লাগলেন আর উপর থেকে রতু জ্যেঠু আর কড়িদা আমাকে দু-হাত দিয়ে ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে উপরে তুললেন এবং উপরে তুলে একটা ফোঁকরের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে বোধহয় গোটা পঞ্চাশ লাল পিঁপড়ে আমার পশ্চাদ্দেশে সজোরে কামড়ালো। বাবা গো! মা গো! করে আমি মুখ থুবড়ে লাফিয়েই পড়তে যাচ্ছিলাম।

বাঘ মারা যে কত কষ্টকর তখনও বুঝিনি। কড়িদা এবং রতু জ্যেঠু আমাকে কিছুতেই লাফিয়ে পড়তে দিলেন না।

বললেন, আরেকটু উপরে উঠে ডালে বসো, ফোঁকরের মধ্যে পিঁপড়ে কেনো, বিছে-টিছেও থাকতে পারে, সাপ থাকাও বিচিত্র নয়।

ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার আমার হয়ে গেছে। আমার পশ্চাদ্দেশ জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কতখানি যে লাল হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কতখানি তা বাড়ি গিয়ে দেখা ছাড়া উপায় ছিলো না। তবুও বাঘ মারার প্রচণ্ড উৎসাহে আমি উপরের ডালে উঠে যেমন বলা হয়, তেমন চুপ করে বসলাম। মুনসের মিঞা চলে গেলো তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। কিছুক্ষণ পরই সন্ধ্যাতারা পশ্চিমাকাশে উঠল। জ্বলজ্বল করতে লাগলো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে উঠল চাঁদ। চাঁদের আলো ধীরে ধীরে জোর হতে লাগলো, আর বাইরে আলো যতো জোর হলো, ঝুপড়ি আমগাছের ছায়াটা ততোই অন্ধকার হতে লাগলো। ফুরফুর করে হাওয়া দিতে লাগলো। গরমের দিন। নদী থেকে আসা চমৎকার হাওয়ায় সাদা পাঁঠাটা আরামে ঘুমাতে লাগলো।

রতু জ্যেঠু ফিসফিস করে বললেন, এ মহাবিপদ। এ পাঁঠা না চেঁচালে বাঘ জানবে কি করে যে, এখানে পাঁঠা আছে?

আমি ফিসফিস করে বললাম, কি করা যায়?

রতু জ্যেঠু বললেন, তোর থলিতে তো অনেক গুলি। তুই এক কাজ কর, পাঁঠাটাকে ঢিল মার গুলি দিয়ে।

বাঘ শিকারের জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আমার যে কিছুমাত্র ভূমিকা আছে তা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত হয়ে উঠলাম এবং থলে থেকে এলজি এবং বুলেট খপাখপ্ ধরে পটাপট্ ছুঁড়তে লাগলাম পাঁঠাটার মাথা লক্ষ্য করে।

যে গুলি বন্দুকের নল থেকে নির্গত হওয়ার কথা তা হাত দিয়ে অন্ধকারে ছুঁড়ে সহজে পাঁঠার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলো না। তিন-চারটে গুলি হয়তো পাঁঠাটার গায়ে লাগছিলো। লাগামাত্র পাঁঠাটা একটা সংক্ষিপ্ত কুঁক্ আওয়াজ করছিলো। যেমন রতু জ্যেঠুর লাথি খেয়ে করেছিলো। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত কুঁক্ ছাড়া ব্যা-ফ্যা ইত্যাদি পাঁঠাজাতীয় শব্দর কিছুই সে করল না।

রতু জ্যেঠু বললেন, ক্ষ্যামা দে।

আমি আবার গুলির ব্যাগ বন্ধ করে ফেললাম।

সময় বয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে নানা রকম রাতচরা পাখি ডাকছে। একটা হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠলো দূরগুম দূরগুম শব্দ করে বুকের মধ্যে ধুক্‌পকানি তুলে। গ্রামের কুকুর ডাকলো, তারপর অনেকক্ষণ ভুক্‌ ভুক্ করে শব্দ করে সেও থেমে গেলো।

দূরের নদীর বুক বেয়ে নৌকা যাচ্ছিলো। চাঁদের আলোয় সে মহাজনী নৌকার বাদামি পাল অতিকায় পাখির সাদা ডানার মতো, যেন স্বপ্নের দেশে ভেসে চলেছিলো। হয়তো উজান বেয়ে যাচ্ছিল নৌকাটা, তাই যারা গুণ টানছিলো, তাদের গুণ টানার হুম্ হুমানি অলস হাওয়ায় নদীর উপর দিয়ে ভেসে আসছিলো আমাদের কানে।

বাঘের কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাঁঠারও নেই। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল রতু জ্যেঠু ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার মুখটা বুকের উপর নুইয়ে পড়েছে। আর মাঝে মাঝে ফোঁৎ ফোঁৎ করে আওয়াজ হচ্ছে। আওয়াজটা কিন্তু একেবারেই বেতালা নয়। দাদ্‌রা কি কাহার বা সেকথা আজ আমার মনে নেই, কিন্তু আওয়াজটা প্রতিবারেই বিশুদ্ধ তালে হচ্ছিলো। আপাতত সে তালের সঙ্গে বাঘের পৌঁছানোর সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ছিলো বলেই মনে হলো। এমন সময় সেই অন্ধকার ছায়ার মধ্যে অন্ধকারতর কি একটা জন্তুকে নড়তে-চড়তে দেখা গেলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর কোনো অবয়ব ছাড়া আরও নিশ্চিততর কিছু আমার চোখে স্পষ্ট হলো না। কিন্তু সে জিনিসটা আস্তে আস্তে গোল করে ছায়াটাকে প্রদক্ষিণ করছিলো। হঠাৎ দেখি, পাঁঠাটা ঘুম ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে যে খুঁটিতে সে বাঁধা ছিলো, সেই খুঁটির প্রান্ত থেকে তার গলায় যতটুকু দড়ি ছিলো, সেই দড়ির শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং ভীষণ উত্তেজিত হয়েছে এবং ছায়াটা যেমন প্রদক্ষিণ করতে লাগলো গাছের ছায়াটাকে, পাঁঠাটাও তেমন তার বিপরীতে আস্তে আস্তে পিছু হেঁটে হেঁটে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো।

কড়িদা দেখতে পেয়েছিলো কি জানি না, কিন্তু আমি বিলক্ষণ দেখলাম যে, চিতাবাঘ এসে হাজির। এক্ষুণি তাকে মারা দরকার। আমি তাই তাড়াতাড়ি রতু জ্যেঠুর হাঁটুতে হাত দিয়ে তাঁকে ঝাঁকিয়ে তুললাম।

আচমকা ঘুম ভেঙে রতু জ্যেঠু বন্দুকটাকে কোলের উপরে শোয়ানো অবস্থাতে রেখেই, দু'হাত দিয়ে চটাচট্ পটাপট্ হাততালি মেরে বললেন, হতভাগা! হতভাগা!

বলতেই পাঁঠাটা এবং বাঘটা দুজনেই ভড়কে গেলো।

ভড়কে গিয়ে বাঘটা একলাফে পালিয়ে গেলো চাঁদের আলোয় ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে এক টুকরো অন্ধকার বিদ্যুতের মতো।

আর পাঁঠাটা, এই প্রথম পাঁঠামি না করে প্রাণ বেঁচেছে সেই আনন্দে ব্যাঁ-এ-এ-এ করে ডেকে উঠল।

আমি ও কড়িদা যুগপৎ বললাম, কি হলো রতু জ্যেঠু?

রতু জ্যেঠু বললেন, ওটা শেয়াল।

কিছুই বলার ছিলো না। জ্যেঠু আমাদের গুরুজন। কিন্তু আমরা পরিষ্কার দেখলাম, যে হতভাগা এসেছিলো, সে শিয়াল নয়, সে মান্যগণ্য বিরাট চিতাবাঘ।

সেই বিফল শিকার যাত্রার পর রাতে মুনসের মিঞার বাড়িতে মোরগা এবং রুটি সহযোগে রাতের খাওয়া সমাপ্ত করে আমরা যখন হুড়্‌খোলা গাড়িতে চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে এসে তামাহাটে পৌঁছলাম, তখন তো গল্প শুনে তুমি রেগে অস্থির।

পিসেমশাইয়ের উপরও তুমি রাগ করলে।

পিসেমশাই হাসতে লাগলেন গল্প শুনে। কিন্তু তুমি বললে, ইসস্, আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম যে, আমার ছেলেকে নিয়ে রতুবাবু বাঘ মারতে যাবেন, তাহলে আমি কখনোই ওকে যেতে দিতাম না। আমি জানি, ও আর কড়ি বুঝি গ্রামেই থাকবে আর রতুবাবু একাই বাঘ মারবেন।

পিসেমশাই হেসে বললেন, বাঘ তো আর মরেনি, আপনার ছেলেও বেঁচে ফিরেছে।

কাজেই বৃথা উত্তেজিত হয়ে লাভ কি?

বাবার যেদিন বরিশালে বদলির অর্ডার হলো, মনে আছে, আমি তোমার শোবার ঘরে বসে, ভবানীপুরের ভাড়া বাড়িতে পড়ছিলাম। বাবা অবিভক্ত বাংলার একটা ম্যাপ নিয়ে এসে খাটের উপরে ম্যাপটা খুলে বসলেন।

বসে তোমাকে বললেন, বলো তো, এবার কোথায় যেতে হবে?

বদলির কথা অনেকদিন থেকেই হচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু বাবা একটি আধা-সামরিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে যুদ্ধকালীন সময়ে বারংবার তিনি বদলির অর্ডার হওয়া সত্ত্বেও নাকচ করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন যুদ্ধ গেছে থেমে, তাই সেবার সে অজুহাতে আর বদলি এড়ানো গেল না।

বাবা আঙুল দিয়ে বাখরগঞ্জ সাব-ডিভিশনের ম্যাপটি আমাদের দেখালেন।

ম্যাপে দেখলাম, সুনীল বঙ্গোপসাগর, আর যেখানে বাংলার মাটি শুরু হয়েছে, তার মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ, নদী-নালা শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে আছে। সেই জায়গাটুকুই বাখরগঞ্জ সাব-ডিভিশন।

তুমি বাবাকে বললে, ওরে বাবা, অত নদী, অত নালা, নিশ্চয়ই কুমীর আছে, সাপ আছে; আমি যাচ্ছি না।

প্রথমে অবশ্য বাবা আমাদের নিয়ে যানওনি। প্রথমে উনি একাই গিয়েছিলেন।

তখন খুবই কষ্ট হতো বাবার একা থাকতে। সে কারণেই আমরা সকলে পরে গিয়ে বাবার সঙ্গে ছিলাম। বরিশালের সেই স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাবার এক বন্ধু যাচ্ছিলেন খুলনা। তিনি খুলনাতে সরকারি অফিসার ছিলেন। তারই তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে আমরা খুলনা অবধি গেলাম।

খুলনা স্টেশনে নেমে দেখলাম অদূরেই নদী। বিরাট বড় স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। স্টীমারের নাম বেলুচি। তার আগে অত বড় স্টীমার কখনও দেখিনি। গঙ্গার ঘাটে জাহাজ দেখেছি বটে, কিন্তু স্টীমার দেখিনি।

বাবার সেই বন্ধু আমাদের স্টীমারে চড়িয়ে চলে গেলেন শোলার টুপি নেড়ে। স্টীমার ছাড়লো বরিশালের দিকে। সে যে কি অভিজ্ঞতা!

সেকেণ্ড ক্লাসের ডেকে আমরা বসে আছি ইজিচেয়ারে! একেবারে স্টীমারের সামনেটাতে ফার্স্ট ক্লাস। তার বিরাট ডেক। তারপরই সেকেণ্ড ক্লাস। চমৎকার খাওয়া-দাওয়া। সেই স্টীমারের মুরগির ঝোল আর ভাতের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। হু হু করে হাওয়া ডেকময় ছুটে বেড়ায়। খবরের কাগজ পড়তে গেলে ফরফর করে কাগজগুলো উড়ে চলে যায়।

পরে যখন রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' পড়ি, তখন স্টীমারের ডেকের বর্ণনায় এই বেলুচি স্টীমারের কথা বারবার মনে পড়তো।

এলাকে অন্তু বলছে, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম, আমার সর্বনাশ'। এই কবিতাটি মনে হলে যেন স্টীমারের ডেক, হু হু হাওয়া, একাত্মভাবে মনে পড়ে যায় বারবার।

স্টীমার চলেছে। দু'পাশে জনপদ, বাংলার গ্রাম, নারকেল-সুপুরি গাছ, গাঁয়ের ঘাটে মেয়েরা নাইছে, কত রকম নৌকা চলছে নদী বেয়ে, আর স্টীমার চলেছে ঢেউ তুলে তুলে, যে ঢেউ নদীর দু'পাশের ঘাটে গিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে ভেঙ্গে পড়ছে দুই কোণাকুণি রেখায়। কত কী স্টেশন!

পরদিন সকালবেলা ঝালকাঠি স্টেশনে এসে স্টীমার দাঁড়ালো। তারপর আরো কত স্টেশন। এখন আর নাম মনে নেই।

বরিশালে অবশেষে গিয়ে পৌঁছালাম আমরা। তোমার সেই ভয় ভয় আতঙ্কগ্রস্ত চোখ দু'টোর কথা এখনও মনে পড়ে।

প্রথমে আমরা থাকতাম আমানতগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। যে বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম, একতলায় দুটো ঘর ছিল। তার পাশে ছিল উঠোন। উঠোনের উল্টো দিকে ছিল রান্নাঘর। এখনও ছবির মতো সব মনে পড়ে। সেই বাড়িটার কাছেই এক বিরাট পুকুর ছিল। সে পুকুরের পাশে মাঝে মাঝে যেতাম বেড়াতে। সে পুকুরে তুমি স্নান করতে দিতে না কখনও। সাঁতারও জানতাম না। কত লোক যে চান করতো। এক ঘাটে মেয়েরা, এক ঘাটে ছেলেরা। বড় বড় মাছ ঘাই দিত জলের মধ্যে। ছোট ছোট ছেলেরা দূর দূর সাঁতার কেটে চলে যেত, এমনকি মেয়েরাও। দেখে বড় হীনমন্য লাগতো।

আমানতগঞ্জ ছাড়িয়ে গিয়ে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসের আরও ওপাশে আমার এক মাসিমার বাড়ি ছিল। মাসিমার বাড়িতে ছুটির দিনে আমরা বেড়াতে যেতাম। দোতলা কাঠের বাড়ি। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঝকঝকে ডাবর থাকতো। প্রথম প্রথম সে ডাবরের তাৎপর্য বুঝতে পারতাম না।

প্রথম দিন তুমি তো শুনেই অবাক!

বললে, কি জংলী দেশে এসেছি রে বাবা!

তখনও বরিশালে খুব চুরি-ডাকাতি হতো, কথায় কথায় কাইজা লেগে থাকতো। এদিক-ওদিক হলেই রামদা দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিত। স্যানিটারী বাথরুমের চল তখন ছিল না। বেশিরভাগ গ্রামের বাড়িতেই বাথরুম থাকতো দূরে। ঐরকম চোর-ডাকাতের জায়গায় রাত্তিরে দরজা খুলে বাইরে বাথরুমে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতো না। তাই ছোট-বড় সব রকম প্রাকৃতিক আহবানের মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেকের শোবার ঘরে বড় বড় পেতলের ডাবর থাকতো। সে ডাবর রোজ ছাই দিয়ে মেজে ঝকঝকে করা হতো।

মাসিমার বাড়ির রান্নাঘর থেকে বসে নদীটা দেখা যেত। পাশেই ছিল বাগান, বাগানের পাশে বাঁধানো ঘাট, বড় পুকুর। পাশের বাড়ির সুন্দরী মেয়ে, জবা, আমারই সমবয়সী; সে আসতো সাঁতার কাটতে। আমার মাসতুতো ভাই মিহির, সেও খুব ভালো সাঁতার কাটতো। আমরা শহুরে ছেলে-মেয়েরা ঘাটে বসে ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।

জবা তখন তার দুধে-আলতা পায়ে ঢেউ তুলে সাঁতরে যেত নিথর কালো জল, তখন আমার মনের ভেতর এমন এমন অনুভূতি জাগতো যে, তার ব্যাখ্যা তখন জানতাম না।

পরে বুঝেছিলাম, তাকেই বলে ভালো লাগা, হয়ত একটু ভালোবাসাও।

জবা জলের মধ্যে সাঁতার কেটে কেটে নকশী কাঁথা বানাতো আর ফোঁড় দিত সেলাইয়ের, আর আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

একবার নদী থেকে একটা কুমীরের বাচ্চা চলে এসেছিল সেই পুকুরে। সে কী কাণ্ড।

মাসিমার বাড়ির কাছে ছিল এক নামকরা ময়রার দোকান। আমরা গেলেই মাসিমা তার কাছ থেকে গরম রসগোল্লা আনিয়ে দিতেন। সেই রসগোল্লার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মাসিমার বাড়ি সাইকেল রিকশা করে যেতে বাঁদিকে পড়তো বিরাট বাদা। হোগলার বন, হলদে পাটকিলে রংয়ের হোগলা। বাদার মধ্যে থেকে কাম-পাখি ডাকতো। ছিটকে উঠতো। সোজা উপরে মাছরাঙা পাখি। রোদ চমকাতো তার রঙিন ডানায়। বাদার জলের গন্ধ ডানায় মেখে বিকেলের নিস্তেজ রোদ সেই হোগলার পাটকিলে রংয়ের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যেত।

ক্যাঁচোর কোঁচোর করে সাইকেল রিকশা চলতো, আর আমি তোমার পাশে বসে সেই গ্রাম্য প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আনন্দে বুঁদ হয়ে যেতাম।

আমানতগঞ্জ ছেড়ে তারপর আমরা কাঠপট্টির বাড়িতে উঠে যাই। কাঠপট্টির বাড়িতে বেশিদিন ছিলাম না। তারও পরে আমরা সেই জর্ডন কোয়ার্টারে থাকতাম। বরিশাল জিলা স্কুলের পাশে, সুন্দর ছিমছাম পাড়া, চমৎকার লাল রঙা সব বাড়ি। আগে সব সাহেব-সুবোরা থাকতেন।

জর্ডন কোয়ার্টারের বাড়িটা স্টীমার ঘাটের কাছে ছিল। অন্ধকার রাতে নদীর বুক চিরে চলে যাওয়া স্টীমারের সার্চলাইটের ঘূর্ণায়মান আলোর ঝলক আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে চমকে যেত।

কাছেই ছিল জিলা স্কুল। আমি যে স্কুলে পড়তাম। বিরাট ছিল তার মাঠ। কত ভালো ভালো বন্ধু হয়েছিল আমার। আতাউর রহমান মনজুরুল করিম। কি সুন্দর মনজুরুলের চেহারা। পড়াশোনায় সে বড়ই ভালো ছিল। একই দেশ, একই মানুষ। রাজনৈতিক মানচিত্র পালটে গিয়ে আজ যে কত ব্যবধান হয়ে গেছে মনজুরুলের সঙ্গে আমার। তখন মনজুরুল গান গাইত– ইকবালের গানকে বদলে দিয়ে গাইত সারে জাঁহাসে আচ্ছা পাকিস্তাঁ হামারা হামারা হামারা।

আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকতাম ওর দীপ্ত চোখে-মুখে। মনজুরুল যে এখন কোথায় আছে, কি করছে, কেমন আছে, কিছুই জানা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। উনিশশো সাতচল্লিশ সনে ক্লাস সিক্স-এ পড়তাম আমরা।

নদীর ঘাটে ইলিশ মাছের নৌকো এসে লাগতো। তিন-চার আনা করে টাটকা ইলিশ পাওয়া যেত। ইলিশের জাল যখন দিত নদীতে, তখন কোনো পরিষ্কার সকালে লাফ দিয়ে উঠতে থাকা রূপোলী আঁশগুলো রোদে ঝিকমিক করে উঠতো।

বরিশালের জমিদার ছিলেন মনোরঞ্জ বর্মন। টকটকে তার গায়ের রং। পরনে সব সময় ধূতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি। সকালবেলায় পূজা পাঠ সেরে, বড় করে সিঁদূরের টিপ পরে কানে মা-কালীর নৈবেদ্য দেওয়া ঝুমকো জবা গুঁজে তিনি হুডখোলা জীপ গাড়ি চালিয়ে আমাদের বাড়ি আসতেন।

বরিশালের অফিসারস ক্লাবে প্রথম টেনিস খেলা শিখি। বাবা একবার কলকাতায় গেলেন কি কাজে। ফেরবার সময় ছোট্ট একটা র‍্যাকেট আমার জন্য নিয়ে এলেন। শিয়ালকোটে তৈরি।

মনোরঞ্জন কাকু বললেন, ভালোই হল। তুমি শিখবে, তাতে আমারও শেখা হয়ে যাবে।

নদীর পাশে ছিল অফিসারস ক্লাব। তাতে টেনিসের বাঁধানো হার্ড কোর্ট। স্কুলের ছুটির পর আমি সেখানে যেতাম টেনিস খেলতে। এবং যেহেতু আমি কিছুদিন আগে আরম্ভ করেছিলাম, মনোরঞ্জন কাকুকে আমিই ট্রেনিং দিতাম।

নদী থেকে হু হু করে হাওয়া আসতো, টেনিস কোর্টের নীলরঙা পর্দাগুলো হাওয়াতে নৌকোর পালের মতো ফুলে ফুলে উঠতো। গায়ের ঘাম সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে দিত সেই হাওয়া।

হাটখোলার সেনবাবুদের বিরাট ব্যবসা ছিল। তাদের অনেক মোটর বোট ছিল। মাঝে মাঝে বাবা শিকারে নিয়ে যেতেন আমাকে। সঙ্গে অনেকে যেতেন। জজ সাহেব, অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অতিক্রম মজুমদার মশায়, আমাদের জিলা স্কুলের হেডমাস্টার মশাই, মনোরঞ্জন কাকু আরও কত লোক, এখন আর সেসব নাম মনে নেই।

দূরে চলে যেতাম আমরা নদী বেয়ে। শীতকালে হাঁস শিকার হতো। অনেক সময় কুমীর। একবার মনে আছে, ভোলার কাছাকাছি চলে গেছিলাম। সে কি বিরাট নদী; মনে হয় সমুদ্র। এপাশ ওপাশ দেখা যায় না। মনে হয় সেই অকূল জলরাশির মধ্যে ছোট্ট বোটটি এক্ষুণি ডুবে যাবে বুঝি।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট নদী-নালার শহরে তোমারও এক বিশেষ ভূমিকা তুমি গড়ে তুলেছিলে। তোমাকে সক্কলে ভালোবাসতো। কত লোক যে বৌদি বৌদি করে আসতো। আর তুমি সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে, সকলকে আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট করতে। সেই সব হাসিখুশী হৈ হৈ দিনগুলোর কথা বড় মনে পড়ে। তখন বাবার বয়সও কত কম ছিল, তোমার বয়সও আরো কম ছিলো। আর আমরা তো ছোট্টই।

মানুষের জীবনে, মানুষের অপ্রাপ্তির সাধ-আহ্লাদ সবই হয়তো একদিন পূরণ হয়। অতৃপ্ত বাসনা কামনা সব পরিপূর্ণভাবে পরিপ্লুত হয়, কিন্তু যৌবন চলে গেলে, আর তা ফিরে আসে না। এ জীবনে যৌবনের বুঝি কোনো বিকল্প নেই। সমস্ত ধনসম্পদ, সমস্ত পার্থিব প্রাপ্তি দিয়েও যৌবনহীনতার গ্লানি ও দরিদ্রতাও কিছুতেই ঢাকা যায় না।

একদিন আমরা পাখি শিকারে গিয়ে নদীতে বান আসার কারণে জীপ নিয়ে নদী পার হতে না পেরে রাতে এক গ্রামেই থেকে গেলাম। পরদিন বরিশালে ফিরে শুনলাম যে তুমি সারারাত ভয়ে বাবার রিভলবারের চামড়ার শূন্য খাপটি বালিশের নীচে নিয়ে জেগে শুয়েছিলে। চোর ডাকাত এলে রিভলবারের হোলস্টার দেখিয়েই তাদের ভিরমী লাগাবে এমন মতলব করেছিলে!

বাবা হাসতে হাসতে এই গল্প বন্ধু-বান্ধবদের করে বেড়ালেন অনেকদিন।

আমরা বরিশাল থেকে ফিরে এলাম দেশ বিভাগের সময়ই। সরকারি চাকরিতে তখন হিন্দু, মুসলমান সবাইকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ভারতে বা পাকিস্তানে থাকার কথা জানাতে হল উনিশ শ’ সাতচল্লিশ সনে।

তোমার ছেলেবেলা কেটেছিল বিহারের এক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঙালি গরিষ্ঠ শহরে। জলে ভয় পেতে তুমি। গ্রাম কাকে বলে জানতে না। তোমার সাপের ভয়, বিছের ভয়, এমনকি ভয় টোকা কেন্নোতেও। সেই যে বড় বড় বাদামী কেন্নোগুলো, টোকা মারলে টাকার মতো গোল হয়ে যেত, সেগুলো দেখলেই তুমি কি আতঙ্কে চীৎকার করে উঠতে। আর ভয় ছিল তোমার আরসোলাতে। সেই তুমিই ইভাকুয়েশানের সময় কলকাতার পাট চুকিয়ে রংপুরের বাড়িতে আমাদের নিয়ে থাকতে ঘোমটা টেনে, কতরকম গ্রাম্যতা মানিয়ে নিয়ে।

রংপুরের বাড়িতে চারটে ঘর ছিল। যে ঘরে আমরা থাকতাম তাকে বলা হতো বড় ঘর। তারই নীচে বাঁশের ধারার ফলস-সিলিং। টিনের দেয়াল, তার মধ্যে অনেক ফুটো-ফাটা। তার ভিত ছিল সিমেন্টের। মাটি থেকে অনেক উঁচু করে বাঁধানো। সে ঘরে আমরা ভাই-বোনেরা, তুমি আর ঠাকুমা শুতাম। সেই বড় ঘরের উল্টোদিকে ছিল রান্নাঘর, মাটির ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া, মাটির সিঁড়ি। রান্নাঘরের ডানদিকে যে ঘর ছিল, তাতে থাকতেন বড় কাকু, তিনি বিয়ে করেননি। বড় কাকুর ঘর পেরিয়ে ছোট্ট একটি ঘর। সেটি ছিল ঠাকুরমার ঠাকুরঘর।

বড় কাকুর ঘরের উল্টোদিকে ছিল বাইরের ঘর। সেটিতে একপাশে বসার বন্দোবস্ত, অন্যপাশে ঢালাও তক্তপোশ পাতা। একসঙ্গে দশজন এসে পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই।

সেই বাইরের ঘরের সামনেটায় ছিল প্রকাণ্ড গোলাপ ফুলের বাগান। কত যে গোলাপ ফুটতো, সে বলার নয়। দূর দূর জায়গা থেকে লোকে আসতো সে গোলাপ বাগান দেখতে। বাগানের সামনে দিয়ে লাল মাটির পথ চলে গেছিল। একদিকে খোঁয়াড়, শংকামারীর শ্মশান, অন্যদিকে শহর, ডিমলার রাজবাড়ির পাশ দিয়ে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে, জিলা স্কুলের সামনে দিয়ে।

গোলাপ বাগানের পাশ দিয়ে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রায় পাঁচ-ছ’কাঠা চওড়া আর বিঘেখানেক লম্বা ফালি জমি ছিল, সে জমি বেয়ে এসে বাড়ির ভিতর ঢুকতে হতো।

সে জমির বাঁদিকে ছিল বাগান, বিরাট বাগান, গোলা কাঁঠালের গাছ, জলপাই গাছ, কতরকম আম।

শীতকালে হলুদ জলঢোঁড়া সাপ রোদ পোয়াত সেই বাগানে। সেই বাগান যেখানে শেষ হয়েছে তার পরে ছিল আলুক্ষেত। সেও বিরাট। একপাশে দাঁড়িয়ে অন্যপাশ অবধি চোখ পৌঁছতো না। সেই আলুক্ষেতের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল ইরিগেশান ক্যানেল। সেই ক্যানেল গিয়ে পড়েছিল ঘাঘোট নদীতে, আর সেই নদী গিয়ে পড়েছিল তিস্তায়।

বর্ষায় যখন বান আসতো তিস্তা নদে, ঘাঘোট নদী ভরে উঠতো জলে। আর ঘাঘোটের জল উপচে যেত ক্যানেল বয়ে। ক্যানেলের জল এসে পুকুর দিত ভরে, বাদামী কালো ডাহুক ডাকতো সারাদিন ছায়াচ্ছন্ন

পুকুরপাড়ে ঘুরে ঘুরে, তাদের শ্যাওলা শরীরে কাঁপন তুলে। সাদা বাদামী বকগুলো ঠায় একপায়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতো আর কত কি ভাবতো। বকেরা সারাদিন কি যে অত ভাবে, ভাবতাম আমি।

বাড়িতে ঢোকার রাস্তার দু'পাশে দুটো কাঠটগরের গাছ ছিল। বড় গাছ। যখন ফুল ফুটতো গন্ধে ম' ম' করতো চারপাশ। হাসনুহানার ঝোপ ছিল, বাতাবিলেবুর গাছ। কাগজিলেবুর গাছ। রান্নাঘরের পেছনে অনেকখানি অব্যবহৃত জমি। তাতে মানকচুর ঝাড়, আশপাশে গজিয়ে উঠতো বর্ষার দিনে কতরকম ব্যাঙের ছাতা। টক পাতার গাছ। কখনও কখনও বা সে ছাতার নীচে ধ্যানগম্ভীর ছাই রঙা ব্যাঙ থাকতো বসে।

সেই ফালি জমিটুকুর পাশে ছিল কুয়োতলা। বিরাট বাঁধানো কুয়ো। কুয়োতলার গা ঘেঁষে একটা সিঁদুরে আমের গাছ। কালবোশেখীর ঝড় উঠলেই ধপাধপ আম পড়তো ঝরে। কি তাদের রং! যেন কেউ সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে।

বড় ঘরের ডানপাশে ছিল ঠাকুমার হবিষ্য ঘর। মাটির উপরে শন ছাওয়া। তার পাশে ঢেঁকিঘর। তারই পাশে গোয়ালঘর। গোয়ালঘরে থাকতো ফুলমণি গাই আর তার বাছুর। গোখরা সাপ এসে কখনও কখনও ফুলমণির পা জড়িয়ে ধরে ফুলমণির দুধ খেয়ে যেত চুরি করে। রাতের বেলায় আসতো বাদুড়ের ঝাঁক। লিচু গাছে লিচু খেয়ে যাবার জন্যে। তখন বাদুড় তাড়াবার জন্য লিচুগাছে কেরোসিনের টিন বেঁধে তাতে লাঠি ঝুলিয়ে লাঠির দড়ি ধরে টানাটানি করতো সারারাত আমাদের নেপালী দারোয়ান বাহাদুর। বাদুড় তাড়াবার জন্য।

কাঁঠাল গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়তো মাটিতে– শান্ত, পাখি-ডাকা কাঁচপোকা-ওড়া দুপুরে গোবর নিকোনো উঠানে। কত তাদের রং। সোনালী, গাঢ় বাদামী, হলুদ। গরমের দুপুরে হাওয়ার গন্ধ, মাঠের গন্ধ, গোবর নিকোনো উঠোনের গন্ধ, হলুদ বসন্ত পাখির গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে যেত।

শেষ বিকেলে ঢেঁকিতে পাড় দিতে তুমি। এখনও মনে পড়ে, তোমার সেই ছিপছিপে সোনারঙা চেহারা, লাল পেড়ে শাড়ি পরেছ তুমি, তোমার লক্ষ্মীমন্ত পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে শাড়ির পাড়, আর ঢেঁকির একপ্রান্তে তুমি দাঁড়িয়ে আছ উপরে ঝোলানো দড়ি ধরে। আর নামছো উঠছো, উঠছো নামছো।

চিঁড়ে কুটতে কখনও। শব্দ হতো বুক বুক; ধুক ধুক। তালে তালে স্বর মিলিয়ে সেই বাদামী লেজ ঝোলা বড় পাখিটা বাইরের বাগানে ডেকে চলতো গুব গুব; গুব গুব।

কলকাতা থেকে বাবা তোমাকে চিঠি লিখতেন নীল রঙের খামে, মোটা মোটা চিঠি। বিকেলে চান করে, চুল বেঁধে, সিঁদুরের টিপ পরে, তুমি বারান্দার এক সিঁড়িতে বসে অন্য সিঁড়িতে পা রেখে সে চিঠি পড়তে।

চিঠি পড়তে পড়তে তোমার মুখের ভাব সেই সুন্দর সুগন্ধি বিকেলের মতো নরম হয়ে উঠতো। কত কি পাখি ডাকতো চারদিকে।

আস্তে আস্তে আকাশের রং গোলাপী হয়ে যেত। আকাশ যখন পরিষ্কার থাকতো, তখন উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো দেখা যেতো। আমি হু হু হাওয়ায় খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে স্বর্গসরণীর সাদা মেঘপুঞ্জের সঙ্গে মিশে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপালী চূড়োর উপরে শেষ সূর্যের গোলাপী রঙের খেলা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠতাম।

কখনও কখনও তুমি রাঁধতে বসতে রান্নাঘরে। সামনে কুপী জ্বলতো। কিন্তু উনুনের আগুনের আভায় রান্নাঘর ভরে থাকতো। উনুনের সামনে বসে তোমাকে দেখাতো দেবী প্রতিমার মতো উজ্জ্বল।

ক্ষেতের লাল মিষ্টি চালের ভাতের গন্ধ ভাসতো মন্থর সান্ধ্য গ্রাম্য হাওয়ায়, শেয়াল ডাকতো ক্যানেলের ধারে, পেঁচা আর বাদুড় ঝুপ-ঝাপ করতো ঝোপে-ঝাড়ে। নির্জনতাকে চমকে দিয়ে তক্ষক ডাকতো নারকেল গাছের গোড়ার ঝোঁপ-ঝাড় থেকে।

বাবা যখন কলকাতা থেকে মাঝে-মধ্যে আসতেন দু'তিন দিনের জন্যে, তখন বলতেন যে, ভাতের ফ্যান মোটে গালবে না। ফ্যানের মধ্যে কত ভিটামিন! কলকাতার কত লোক 'একটু ফ্যান দাও মা, ফ্যান দাও মা' বলে

কেঁদে মরছে।

কিন্তু তুমি রোজই সে কথা ভুলে যেতে। অন্যমনস্ক হয়ে ভাতের ফ্যান গালতে। বাবা পিচবোর্ডের উপরে কাগজ সেঁটে তাতে বড় বড় করে লিখে দিয়েছিলেন 'ভাতের ফ্যান গালিবে না' এবং সেই পিচবোর্ডে লেখাটা উনুনের পেছনের দেয়ালে, বাঁশের খুঁটিতে পেরেক দিয়ে মেরে দিয়েছিলেন। রান্না করার চৌকিতে বসে সে লেখাটা যাতে চোখের সামনেই থাকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি দু'একদিন ভুলে যেতে।

রান্নাঘরের পাশে যে কাগজিলেবুর গাছটা ছিল, সেই লেবুতে এতো রস হত যে, বাহাদুর বলতো 'কুঁইয়া কা পানি'। সেই লেবুর গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে।

ক্ষেতের চালের ভাত, ক্ষেতের আলুভাজা, আর তাতে কাঁচা লঙ্কা ডলে আর সেই লেবু টিপে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে মাটির রান্নাঘরে বসে যে ভাত খেতাম, সে ভাতের স্বাদ পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শহরের শ্রেষ্ঠতম হোটেলের খাওয়ার ঘরে বসেও পাইনি।

রংপুরে বড় মাছ বিশেষ পাওয়া যেত না। তুমি আবার ছোটো মাছ একেবারেই খেতে পারতে না। ছোটো ছোটো পুকুরের কুচোকাচো মাছ, গরমের দিনে কৈ, শিঙি পুকুর-সেচা; শীতকালে পুঁটি, খয়রা, বাটা এইসব। তুমি রেঁধে দিতে, বড় ভালো রান্না করতে তুমি; কিন্তু সেই ছোটো মাছ খেতে পারতে না কখনও। খেলেও, ভালোবেসে খেতে না।

খাওয়ার কথা উঠলে কত কথাই যে মনে পড়ে, শীতের কি বর্ষার রাতে তোমার ভুনি খিঁচুড়ি, সেই খিঁচুড়ি রান্না তুমি শিখেছিলে, দিদিমার কাছ থেকে।

দিদিমা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা ছিলেন। গিরিডিতে প্রতি সপ্তাহে তার গুরুভাইরা এসে জমায়েত হতেন বাড়িতে। বিকেলে মোহনভোগও হতো। সেই রকম মোহনভোগও তুমি আমাদের রেঁধে খাওয়াতে। এমন মোহনভোগ আর কখনও খাবো না। কড়া করে সুজি ভেজে, ভালো করে ঘি ঢেলে, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে কী অপূর্ব মোহনভোগ যে তুমি রাঁধতে, সে যে না খেয়েছে, তার পক্ষে বোঝাই মুশকিল।

খিচুড়িতে কড়াইশুঁটি দিতে। ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ি। বেশি পাতলাও নয়; আবার খুব ঘনও নয়। কী যে তার স্বাদ। সঙ্গে শুকনো লঙ্কা ভাজা, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, ডিম ভাজা। তোমার খিচুড়ির গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। কত জায়গায়ই তো খিচুড়ি খাই, কিন্তু অমন খিচুড়ি আর কেউই রাঁধতে পারে না।

আর তোমার কড়াইশুঁটির চপ? কিভাবে যে করতে, তা তুমি একাই জানতে। যাওয়ার আগে কাউকে একটু শিখিয়েও গেলে না! তুমি আমাদের ভালোবাসতে না ছাই! ভালোবাসলে মানুষ ভালোবাসার জনদের এমন করে হঠাৎ ফেলে চলে যায়?

কড়াইশুঁটির চপের পুরটার আলাদা বিশেষত্ব ছিল, আর বিশেষত্ব ছিল চপের উপরের আবরণের। সেই চপ যেই-ই খেয়েছে আমাদের বাড়িতে, সেই-ই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে তোমাকে বলতাম, পড়াশুনা করে আর কী হবে, তোমার চপের রেসিপিটা শিখিয়ে দাও, একটা দোকান দেবো রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে, খালি এই চপেরই। গাড়ির পর গাড়ি এসে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার দোকানের সামনে। চপ বেচেই বড়লোক হয়ে যাবো।

তুমি কথা শুনে হাসতে।

বলতে, তা আর করবি না? চপ বিক্রি করেই তো খাবি!

খাওয়ার কথা ভাবলে আরো কত কথা যে মনে হয়, তোমার রান্নার কথা। ইলিশ মাছ রাঁধতে তুমি কত রকম, ভাপা-ইলিশ, দই-ইলিশ, কালো জিরে সরষে দিয়ে ইলিশের ঝোল। হলুদ-রঙা।

সরস্বতী পূজোর দিন দুপুর বেলায় আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের বাড়িতে জোড়া ইলিশ রান্না হতোই। তখনকার দিনে সারা বছর ইলিশ মাছ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না! প্রতিবছর ইলিশ মাছ খাওয়ার মহরৎ হতো সরস্বতী পূজোর দিনে। জোড়া ইলিশ লাউডগা দিয়ে রান্না হতো। পাতলা ঝোল, কালোজিরে কাঁচা লঙ্কার সঙ্গে। সে ঝোলের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আর সরস্বতী পূজোর রাত্রিবেলা প্রত্যেক বছরই হতো খিচুড়ি। তেমনি কালী পূজোর দিন রাত্রে হতো লুচি-মাংস।

মাংসই বা কতরকম করে রাঁধতে জানতে তুমি! অমন হলুদ-রঙা টক-মিষ্টি-ঝাল স্বাদু দই, মাংস আর খাই না। সেই মাংসের ঝোল দিয়ে থালা থালা ভাত খেতাম আমরা। চিতল মাছ, চিতল মাছের মুঠা, চিতল মাছের পেটি, কৈ মাছ, সরষে কৈ, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে তেল কৈ, রুই মাছের দই মাছ, রুইয়ের কালিয়া আরও কত কী রান্না।

বাবার এক বন্ধু ছিলেন, তার বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। তারই প্ররোচনায় বাবা একদিন শুঁটকি মাছ এনে হাজির করলেন। সকলের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। বাড়িওয়ালা আমাদের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয়ার উপক্রম করলেন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা?

বাবা বললেন, হোল-সাম ফুড। ফুল অফ প্রোটিন। এত লোকে খায়, আর যারা খায় তারা কত খাটতে পারে জানো? ভালো করে পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে রান্না করো। আগে জলে সেদ্ধ করে নাও, কিছু গন্ধ থাকবে না।

তুমি বাবার কোনো ব্যাপারেই কোনোদিন আপত্তি করতে না।

আঁচলের এক কোণায় একটু অগুরু ঢেলে, সেই আঁচল নাকের সামনে ধরে তুমি সেই শুঁটকি মাছ রান্না করলে।

প্রথম দিন বাবা একাই খেলেন, তুমি তো ছুঁলেই না, আমরাও ধারে কাছে গেলাম না। অথচ তখন বাবার শাসন অগ্রাহ্য করি, এমন সাহস আমাদের কোনো ভাইবোনেরই ছিল না। এটা খাবো না, ওটা খাবো না, এসব বায়নাক্কা কোনোদিনও বাবা প্রশ্রয় দেননি।

একদিন মিনু বলেছিল, নিমপাতা খেতে ভালো লাগে না।

বাবা বলেছিলেন, মনে করো, এমন একটা দেশে গেলে, যেখানে খালি নিমপাতারই গাছ। নিমপাতা ছাড়া আর অন্য কোনো গাছই নেই। না সেখানে ধান ক্ষেত, না কোনোরকম ডাল পাওয়া যায়, না অন্য কিছু, তখন তুমি কি করবে। তুমি কি না খেয়ে থেকে মরে যাবে?

না নিমপাতা খাবে?

মুখ বিকৃতি করেও মিনুকে নিমপাতা খেতে হয়েছিল।

বাবার কড়া শাসনে আমাদের তিন ভাই-বোনের মধ্যে কারোরই এই ডাল খাই না, ওই মাছ খাই না এসব প্রেফারেন্স গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই হয়নি।

যাই হোক, সেই প্রথমদিনের শুঁটকি পর্বর পর থেকেই বাবার পীড়াপীড়িতে মাঝে মাঝেই বাড়িতে শুঁটকি মাছ আসতে লাগলো। ঘোরতর পশ্চিমবঙ্গীয় বাড়িওয়ারা নেপথ্যে বলতে লাগলেন যে, বাঙালগুলোর জন্য দেশছাড়া হতে হবে।

তখনও ভাগ্যিস দেশ ভাগ হয়নি।

শেষের দিকে মনে আছে, তুমি নিজেও বেশ তৃপ্তি করেই শুঁটকি মাছ খেতে এবং এমন উপাদেয় করে রান্না করতে যে কী বলবো। পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কা দিয়ে ভালো শুঁটকি মাছ, ভালোভাবে রান্না করলে তা দিয়ে যে এক থালা ভাত এমনিই খাওয়া যায় তা নিজে খেয়েই বুঝেছিলাম।

বহরমপুরের অনুপম কাকুর স্ত্রীর কাছ থেকে তুমি তেহারি রান্না শিখে এলে। তাই নিয়ে চললো ক'দিন এক্সপেরিমেন্ট। তখন বাঙালি রান্না, এ দেশীয় এবং পূর্ববঙ্গীয় এবং কিছু কিছু মোগলাই রান্নার চল হয়েছে। চাইনিজ খাওয়া তখন কাকে বলে খুব কম লোকই তা জানতেন। স্বাধীনতার এত বছর পর আজ যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটা আন্তর্জাতিক রুচি গড়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতার পরে যে দক্ষিণ ভারতীয় এবং উত্তর ভারতীয় বিশেষ করে পাঞ্জাবের খাওয়া-দাওয়া এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, আমাদের ছেলেবেলায় তা মোটেই ছিল না। কোনো নতুন রান্না কোথাও খেয়ে এলে, কী কোথাও তার খবর শুনে এলে তোমার এবং বাবার সে বিষয়ে উৎসাহের অন্ত থাকতো না।

১১.

আমাদের বিভিন্ন বাড়িতে কত যে, আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বছরে দু'তিনটে করে বিয়ে লেগেই থাকতো। তখনকার দিনে নাওড়ি ঝিয়োরিরা এসে বিয়ের আগে থেকেই উপস্থিত হতেন। এক একটা বিয়ে মানে এক এক মাস বাড়ি ভর্তি লোকজন, অঢেল খাওয়া-দাওয়া, অনিবার্ণ চিতার মতো উনুন জ্বলা আর পড়াশুনার বড়ই অসুবিধে।

আগেই বলেছি, পূর্ববঙ্গীয় যৌথ পরিবারের অনেক কিছুই ভালো কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েরা বড়ই অনাদৃত সেখানে। তাদের পরীক্ষা আছে কি নেই, তাদের পড়াশুনার ঘর আছে কি নেই, এ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখিনি।

কত আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে হয়েছে, আজ তারা কোথায় কোথায় চলে গেছেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘরসংসার পেতেছেন। হয়তো ইচ্ছা থাকলেও যোগাযোগ আর নেই। কলকাতায় যদিওবা তারা আসেন হয়তো আমাদের বাড়িতে তারা আসেনও না; সময়ও হয় না।

হয়তো সত্যিই হয় না!

মানুষের জীবন এরকমই। যে যার নিজের ঝামেলা, নিজের যন্ত্রণা, নিজের ঝক্কি নিয়েই আছে। কিন্তু যোগাযোগ থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন, যারা তোমাকে জানতেন, তোমার কাছে ছিলেন কখনও, তোমার মধুর ব্যবহারে যারা সিঞ্চিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনও যে তোমাকে আজও মনে করেন না, এমন হতেই পারে না।

তুমি নইলে কোনো বিয়ের সম্বন্ধ হতো না। যদি আমাদের বাড়িতে কোনো আত্মীয়াকে বরপক্ষ দেখতে আসতেন, তুমি নইলে সে আত্মীয়ার মা-বাবা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়তেন। তুমি ছিলে বলে কত বিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, বিয়ের সময় যে কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে ঘটতে ঘটেনি সে কথা যারা জানেন, তারাই জানেন।

কেউ তোমাকে মামিমা বলতেন, কেউ বলতেন মাসিমা, কেউ বলতেন কাকিমা, কেউ বলতেন পিসিমা, কেউ বলতেন বৌদি, যে যে নামেই ডাকুক না কেন, তুমি সকলের কাছেই ছিলে সমান প্রিয়।

আজকে তোমার অবর্তমানে সমস্ত সম্পদ, সুন্দর সাজানো বাড়ি, সাজানো বাগান, সব যেন খাঁ খাঁ করে। মনে হয় লক্ষ্মী চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে। তোমার শ্রীহস্তের ছোঁয়া আর যেন কিছুই পায় না এ বাড়ি।

প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির আগে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে সারা বাড়ি পরিষ্কার করাতে, ঝুল ঝাড়াতে; সব কিছু নতুন হতো। পয়লা বৈশাখের আগে আগে কোনো ছুটির দিনে সকালে বাবা ও তুমি একই সঙ্গে নিশ্চয়ই নিউমার্কেট যেতে। আমার বরাদ্দ ছিল প্রতিবছর নববর্ষে আমার ঘরের জন্য নতুন একটি পাপোষ এবং সুন্দর একটি বেড-কভার।

তুমি চলে যাবার পর পয়লা বৈশাখকে আর পয়লা বৈশাখ বলে মনে হয় না। সারা বাড়ির চাকর-বাকর, লোকজন, মায় কুকুর-বেড়াল, সকলেই তুমি নেই বলে কেমন মনমরা হয়ে থাকে।

বাড়িতে যা কিছুই রান্না হতো না কেন, তুমি সব থেকে আগে, চাকর-ঠাকুর কি খাবে, তাদের ভাগটা আলাদা করে তুলে রাখতে। ড্রাইভার তার ডিউটি শেষ করে যত রাতই হোক না কেন, যখন বাড়ি যেত, তুমি তাকে নিজে ডেকে জিজ্ঞেস করতে যে সে খেয়েছে কিনা এবং যদি তার খাওয়ার সময় তুমি নিজে না দেখতে পেতে, তাহলে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করতে কি খেয়েছে সে।

তুমি চলে গেছ বলে, ওরা যত দুঃখী হয়েছে, তেমন দুঃখী আর কেউ-ই হয়নি। জন্তু-জানোয়ার তারাও ভালোবাসা বোঝে। তারাও বোঝে কোন্ মানুষটা কোন্ চোখে তাদের দিকে তাকায়, কোন্ মানুষটা অন্তরে তাদের প্রতি কী অনুভূতি আছে; আর আমরা তো মানুষ। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার ভালোবাসা যারা পেয়েছে; তারা তোমার কথা কী এত সহজে ভুলতে পারে?

আমি চিরদিনই একটু অন্যরকম ছিলাম। সে কারণে, তুমি প্রায়ই আমাকে ভুল বুঝতে। নানা ব্যাপারে তোমাকে আমি ক্ষ্যাপাতাম, তোমার আমাদের নিয়ে ভয়, উৎকণ্ঠা সব সময় তোমার আঁচলে আড়াল করে রাখার চেষ্টা এসব নিয়ে।

প্রায়ই তোমাকে বলতাম হাসতে হাসতে, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী। রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি।'

বাঙালি মায়ের দোষ অনেক। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সেই মা-হারা হয়; সেই-ই জানে তার গুণ।

তিনখানার উপরে যেদিন বাবা চতুর্থ গাড়ি কিনলেন, সেদিন আমি আমার ডাইরিতে লিখেছিলাম, 'তোমার বখে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। তুমি কখনই শুধু যেন বাবার পরিচয়েই পরিচিত হয়ো না। সংসারে যার নিজের পরিচিতি নেই, যে বাবা মামা, কাকা, জ্যাঠার পরিচয়েই পরিচিত থাকে, সে মানুষই নয়।'

এই পাশ্চাত্য দেশীয় মনোবৃত্তি তুমি বরধাস্ত করতে পারতে না। বাবাও পারতেন না। হয়তো আজকেও আমার এই স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী প্রকৃতি এবং আত্মসম্মানবোধ পুরোপুরি মেনে নেয়া হয়তো বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আর তুমি তো ভুল বোঝাবুঝির ওপারেই চলে গেছো।

স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর বাবা বললেন, বাড়িতে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হবে, তার চেয়ে আমার অফিসে আসবে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে। কাজ শেখো।

তোমার কড়া শাসনে আমি তখনও এমনই ক্যাবলা ছিলাম যে, আট নম্বর বাসে উঠে যখন অফিসের দিকে রওনা হলাম, তখন চৌরঙ্গীর মোড়টা ঠিক কোথায়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম না।

একটা বড় মোড় দেখে যখন নেমে পড়লাম এবং বাসটা চলে গেল, তখনই বুঝলাম যে, এটা চৌরঙ্গী নয়। একটা ঝাঁকা মুটে তার ঝাঁকার ওপর বসে বিশ্রাম করছিল, তাকে বললাম, ভাই, এই জায়গাটার নাম কি?

সে বলল, ওয়েলেসলি বা।

আমি বললাম, ধর্মতলা কোন্দিকে যাবো?

সে বলল, যে বাস থেকে নেমেছিলেন, সেই বাসেই তো ধর্মতলা যাবেন।

তখন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বাসের অপেক্ষায় সময় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বাস এলে ধর্মতলা পৌঁছলাম।

আরও বেশ কিছুদিন পর আমি তখন কলেজের ছাত্র, তুমি পূজোর সময় আমাকে দুশ' টাকা দিলে। বললে, খোকন, তুই খুশি মতো জামা-কাপড় কিনে নিস্।

আমি তোমাকে বললাম, আমি তো অনেক বড় হয়ে গেছি আর রোজগারও করছি। এখন আর আমাকে এমন

করে টাকা দিও না। টাকা চাই না আমি। বরং বাবাকে বলো, যদি বাবা মনে করেন, তাহলে আমার মাইনে একটু বাড়িয়ে দিতে। বড় হয়ে যাবার পর হাত পেতে টাকা নিতে লজ্জা করে।

তুমি পুরোপুরি বাঙালি মায়েরই মতো তোমার দুবির্নীত ছেলের কথাতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

বললে, তাহলে তোর বাবা এত টাকা কেন রোজগার করেন?

আমি বলেছিলাম, সে কথা তুমি বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো। সেকথা আমার জানার নয়।

কিন্তু বাবার রোজগারের টাকাতে আমার কোনো অধিকার নেই; এবং সে টাকা নিতেও রাজি নই।

জানি না, হয়তো তুমি চলে যাবার আগে আগে বুঝেছিলে কি না যে, তুমি আমাকে যতখানি অবাধ্য ভাবতে, যতখানি দুবির্নীত ভাবতে, আমি ঠিক ততখানি ছিলাম না। হয়তো অন্যরকম ছিলাম, কিন্তু সেটা তোমাদের অপমান করার জন্য নয়।

হয়তো অন্য দেশে জন্মালে আমার এই মানসিকতা, অন্যের প্রশংসার দাবি রাখতো।

যেহেতু আমি এই দেশে জন্মেছিলাম, যেহেতু এই দেশে এরকম মানসিকতা সাধারণ ছিল না, বিশেষ করে ঐ সময়ে; সেহেতু আমাকে চিরদিনই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে হয়েছে।

তুমি যে কত বুঝদার ছিলে! তোমার জন্য কিছুমাত্র করতে গেলে, তুমি সব সময় বলতে না, না থাক্ থাক্। তোর কত অসুবিধা, তোর কত খরচ, তুই এত টাকা দিবি আমাকে? আমার জন্য তুই এত ভালো শাড়ি কিনলি?

আমি বলতাম, তোমাকে দেবো না তো কাকে দেবো?

তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলাম যে, শুধু মা-বাবাকে নয়, সবাইকে দেওয়ার আনন্দ কী!

বিনা স্বার্থে, বিনা কারণে কারো জন্য কিছুমাত্র করার সমস্ত আনন্দটুকুই যে করে তা যে তারই একার।

এই অকৃতজ্ঞ হিসেবী, ভণ্ড, চক্ষুলজ্জাহীন জগতে তোমাকে লোকে বোকা বলতো।

বলে, আমাকেও

কিন্তু যে চক্ষুলজ্জাহীন ভণ্ড মানুষরা তা বলে, তাদের হাসিমুখে ক্ষমা করার ক্ষমতাও তুমিই দিয়েছিলে।

জীবনে যা পেয়েছি, ভবিষ্যতে যা-ই পাব, তার সমস্তটুকুই তোমার দেয়া। তোমার প্রত্যেকের প্রতি নিষ্কলুষ শুভ কামনায় ভরা, আতরগন্ধী অন্তরের ঔদার্যের কারণে।

সেই আমার একমাত্র উত্তরাধিকার।

তুমি উইল করে কিছুই দাওনি আমাকে। দিলেও নিতাম না আমি।

কিন্তু যা তুমি দিয়েছিলে, সেই সম্পদ অমূল্য। সে সম্পদ সকলে অন্তরে ধরে রাখতে জানে না। সকলের অন্তরে ভগবান সে ঔদার্য দেনও না।

এ সংসারে গরীব সেজে থাকা, কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করা, টাকা-পয়সাকেই পরমধন বলে জানাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

আমি সেই অর্থে বুদ্ধিমান নই। তুমি আমাকে সেই দুর্বুদ্ধি দাওনি কোনোদিন। তোমার কাছে আমি এ কারণে আজীবন, অশেষ কৃতজ্ঞ।

কাউকে কিছু দেয়ার, দিতে পারার আনন্দ যে কী, কতখানি; তা সেই সব ভণ্ড মানুষরা, সাবধানী অর্থগৃধ্নু মানুষেরা কখনও জানলো না, জানবেও না।

একটা কথা ভেবেই আমার বড় দুঃখ হয় যে, আমাকে তুমি খুবই ভালোবাসতে বলেই আমার দ্বারা তুমি অনেক দুঃখও পেয়েছো।

আজকে তুমি নেই। আমার ব্যাখ্যা হয়তো কোনো প্রয়োজনে লাগবে না তোমার। তবু আমার বিবেকের কারণে, আমার নিজের কাছে নিজেকে জবাবদিহি করার কারণে আমি এ কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

সংসারে অনেক দুঃখই মানুষকে পেতে হয়। আর্থিক দুঃখ, পারমার্থিক দুঃখ, এর মধ্যে কোনো দুঃখ অন্যের চেয়ে বড় অথবা ছোট নয়। যে দুঃখ আমাদের পেতে হয়ই, তার কিছু কিছু আমাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল; কিন্তু এমন অনেক দুঃখও পেতে হয়, যার জন্য আমরা নিজেরা দায়ী নই।

যেসব দুঃখ আমার কারণে তুমি পেয়েছিলে, তার জন্য তুমি নিজে বিন্দুমাত্র দায়ী ছিলে না। অথচ দুঃখ তোমাকে পেতেই হয়েছিল। তোমার সেই পুরনো গানের কথাতেই বলি, যার দুঃখ, তার সুখ, সুখের উপরে দুঃখ।

যে মানুষ দুঃখ সইতে না জানে, যে মানুষ দুঃখ এবং আনন্দকে সমান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জীবনে স্বীকার করতে না জানে, সে মানুষই নয়।

এত তোমারই শিক্ষা, তুমিই তো আমাকে এই কথা শিখিয়েছিলে, তাই মাঝে মাঝে যখন মাঝরাতে ঘুম আসে না, একা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবি, তুমি কি সুখে আছো?

অথবা তুমি কি সব দুঃখের দুয়ার পেরিয়ে গিয়ে এক প্রগাঢ় আনন্দের জগতে বাস করছো?

না কি শরীরের খাঁচা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আত্মার দুঃখ থাকে?

তখনও কি আত্মা প্রিয়জনের দুঃখে কাতর হয়, তখনও কি তার পুরনো আবাসের কাছাকাছি সে ঘুরে বেড়ায়?

যখন খুব ঝড় ওঠে, প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ে, বজ্রপাত হয়, তখন ভাবি তুমি কোথায় আছো?

তুমি কি বিদ্যুৎ চমকে ভয় পাচ্ছে? তুমি বড্ড ভয় পেতে বাজ পড়লে। বাচ্চা মেয়ের মতো।

তোমার মাথায় কি ছাদ আছে মা? মহাশূন্যের ঘরের জানালা-দরজাগুলো ঝড় ওঠার আগে তোমার চুরি পরা সোনার বরণ আঙুলে তুমি কি বন্ধ করে দিয়েছো?

না, তুমি এই দুর্যোগের রাতে ভিজে গিয়ে ঝড়ে, জলে, অন্ধকারে শীতে কেঁপে উঠছো?

কিছুই জানি না। অথচ কত কিছুই জানি আমরা। আমরা জানি মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে, আমরা জানি মানুষের মগজ বাইরে বের করে এনে মানুষের মগজে বড় বড় সার্জেনরা অপারেশন করছেন।

আমরা জানি যে, শিগগিরই ক্যান্সারের ওষুধ বেরোবে।

আমরা জানি যে, পৃথিবীতে লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ, কিন্তু এদের মধ্যে একজনও অন্যের মতো নয়, নয় শরীরে, নয় মনে।

আমরা জানি এক মা-বাবার একাধিক সন্তান হয় অথচ তারাও কেউ নয় একে অন্যের মতো, নয় মনে, নয় স্বভাবে।

তাই তো ভগবান বিশ্বাস করি।

বিজ্ঞান শুধু আবিষ্কারই করে, বিজ্ঞান কিছুই উদ্ভাবন করে না।

যা তারই ছিল, যা তারই দান, যা তারই সৃষ্টি, তাকেই ভাস্কো ডা গামার মতো পাল তোলা নৌকায় চড়ে গিয়ে মানুষ আবিষ্কার করে এবং আবিষ্কার করে মিথ্যা উদ্ভাবনের আত্মশ্লাঘায় বেঁকে ওঠে।

যদি আমাদের পুণ্য আত্মার মৃত্যু না হয় কখনও, তবে তুমি নিশ্চয়ই আছো আমার কাছেই, দিনের আলোর উজ্জ্বল উদ্ভাসের গভীরে উদ্বেল অন্ধকার রাতের তারারা যেমন থাকে!